মেঘরঞ্জনী

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলি-৬

সূচি
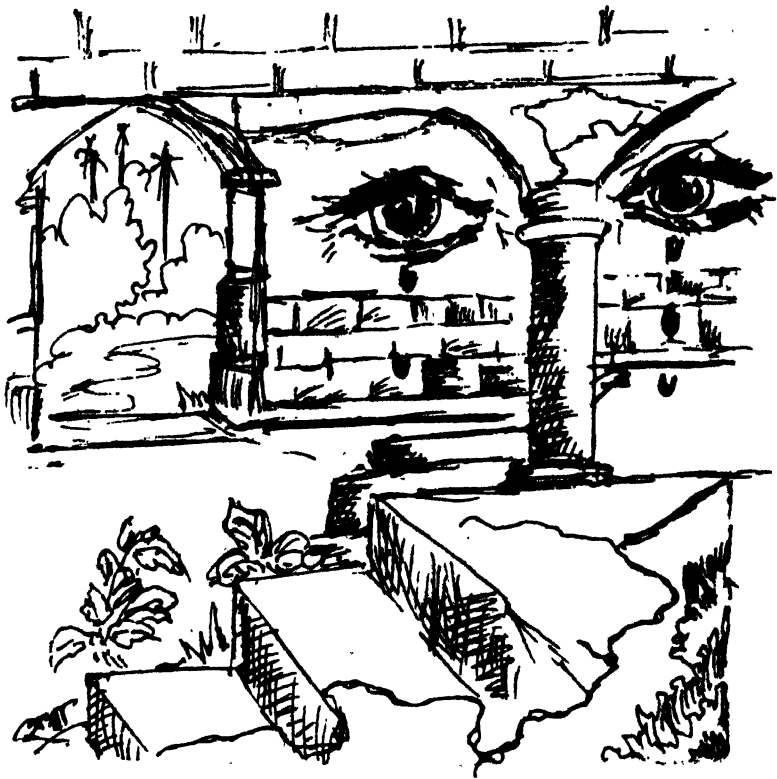
নিশ্চিহ্ন

কপালের ঘা টা এখনও শুকোয়নি। ছোট্ট আয়নায় আদিনাথ মুখটা একবার দেখে নিল। দিন কুড়ি আগে ঐ সিঁড়ির উপর পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল। অনেকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছিল। পরে ওখানটা পেকে ঘা মত হয়েছে। এখনও শুকোয়নি।

মেঝের উপর ছড়ানো পাতলা কম্বল, দুটো চাদর আর একটা তোবড়ানো বালিশ। দু'-এক জায়গায় ফেটে গিয়ে তুলো বেরিয়ে পড়েছে। একটা কাঠের বড় সিন্দুক। তাতে একটা জং ধরা লোহার তালা। চট করে খোলা-বন্ধ করা যায় না। ওতে কয়েকটা রং চটা পুরানো জামা, দুটো প্যান্ট, ছেঁড়া গেঞ্জি আর কটা তামার পয়সা। দামি কিছু নেই। "তবে আর তালা কেন?" লজ্জায় জিভ কাটে আদিনাথ। "চোর আমার ঘরে আসবে না, জানি। তবে কিনা ছিঁচকে লোকের তো অভাব নেই। তারাই যদি দেখতে পেয়ে ...। ওগুলো নিয়ে গেলে যে একেবারে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে যাব।"

আদিনাথ মুখে বলে না বটে। সিন্দুকে একটা দামী জিনিসও আছে। একদম নতুন একজোড়া ধুতি-পাঞ্জাবি। ধবধবে সাদা। কোনও অনুষ্ঠানে গেলে ওটাই পরে। যদিও এখন আর তেমন কোনও অনুষ্ঠানে তার ডাক পড়ে না। সেদিন চলে গেছে, যখন আশেপাশের বাড়ির সামাজিক অনুষ্ঠানে 'ঘড়িবাড়ি'-র মালিক আদিনাথ নিমন্ত্রিত হতই। এই মালিক শব্দটায় আদিনাথের ঘোরতর আপত্তি আছে। "কি যে বলেন, আমি আবার মালিক হলুম কই? আমি তো কেবল দেখাশোনা করি। এতদিনকার পুরনো বাড়ি। রাজপ্রাসাদের মত। একসময়ে তো জমিদাররাই থাকত এখানে। এখন যদি একটু দেখাশোনা না করি, তবে তো সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

সবাই বলত, "সে তো ঠিকই। এ বাড়ির একটা ঐতিহ্য আছে। ইতিহাস আছে।" ঘড়িবাড়ির কথা উঠলে আদিনাথ যেন আর থামতে চাইত না। "এতো আমাদের গর্ব্বের বিষয়। আজকাল কত বড় বড় বাড়ি হচ্ছে। তবু আমাদের গর্ব্ব কিন্তু এটাই। ঠিক বলিনি, বাবু?"

নির্দ্বিধায় সবাই সায় দিত। সত্যিই এটা একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক স্মৃতি। সেই ক'বে জমিদার বংশের উচ্ছেদ ঘটেছে। রাধামোহন মুখার্জ্জী ছিলেন শেষ বংশধর। নিঃসন্তান রাধামোহনের মৃত্যুর পর থেকে এ বাড়ি খালিই পড়ে আছে। বিশাল এলাকা জুড়ে এই বাড়ি। রাজপ্রাসাদের মত। তারই এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চাকরবাকরেরা কয়েক পুরুষ ধরে বাস করছে। বাড়ির অবস্থাও ক্রমশ শোচনীয় হয়ে চলেছে। চুন, বালি, পলেস্তারা, ইঁট সবই ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। কোনও কোনও জায়গা বেশ বিপদজনক হয়ে উঠেছে। মানুষের সংখ্যাও কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত আদিনাথরাই থেকে গেছে। আদিনাথ বিপত্নীক। ছেলে-পুলে নেই। ফলে এখন সে একাই পুরো বাড়িটা দেখাশোনা করে। তবে ভেঙে পড়া ইঁট আর জোড়া লাগাতে পারে না। এ বাড়ি মেরামতে বিশাল খরচ। তার ক্ষমতার বাইরে।

আদিনাথ প্রায়ই বলে, "সরকার তো আবার নিয়ে নিলেই পারে। বাড়ীটার একটা হাল ফিরত।" শুনেছে, প্রথমে সরকারই বাড়িটা গ্রহণ করেছিল। পরে ব্যারাকপুরের প্রদোষ চক্রবর্ত্তী নামে এক ভদ্রলোককে বিক্রি করে দেয়। জলের দরে বাড়িটা কিনে নেন তিনি। সেদিনটার কথা আজও মনে পড়ে। আদিনাথ তখন যুবক। তিন চার জন সরকারী কর্মচারী বড় বড় ফিতে দিয়ে কি সব মাপজোখ করে গেল। তারপর আদিনাথকে ডেকে পাঠাল। প্রদোষবাবুও ছিলেন। আদিনাথের পিঠে হাত রেখে তিনি বললেন, "তুই এখানে আছিস তো?" আদিনাথের ঘাড়টা একপাশে ঝুঁকে পড়ে। "তুই একটু দেখাশোনা করিস। ব্যারাকপুর থেকে তো এখানে আমার আর আসা হবে না। তুই-ই দেখিস সব। মাসে মাসে হাজার টাকা পাবি।" আদিনাথের ঘাড়টা আবাব একপাশে হেলে পড়ে।

ব্যাস, সেই থেকেই এ বাড়ীকে প্রাণ দিয়ে আগলে রেখেছে সে। মাঝে মাঝে ছেলে-ছোকরার দল খেলতে এসে পুরানো ইঁট ধরে টানাটানি করে। খুলে নেবার চেষ্টা করে। আদিনাথ রে-রে করে বাঁশ নিয়ে তেড়ে যায়। এ বাড়ীর প্রতিটি ইঁট যেন আদিনাথেব পাঁজর। সযত্নে আগলে রাখে ওগুলোকে।

দোতলা বাড়ী, তবে দৈত্যের মত বিশাল। একতলার একটা ছোট ঘরে আদিনাথ তার
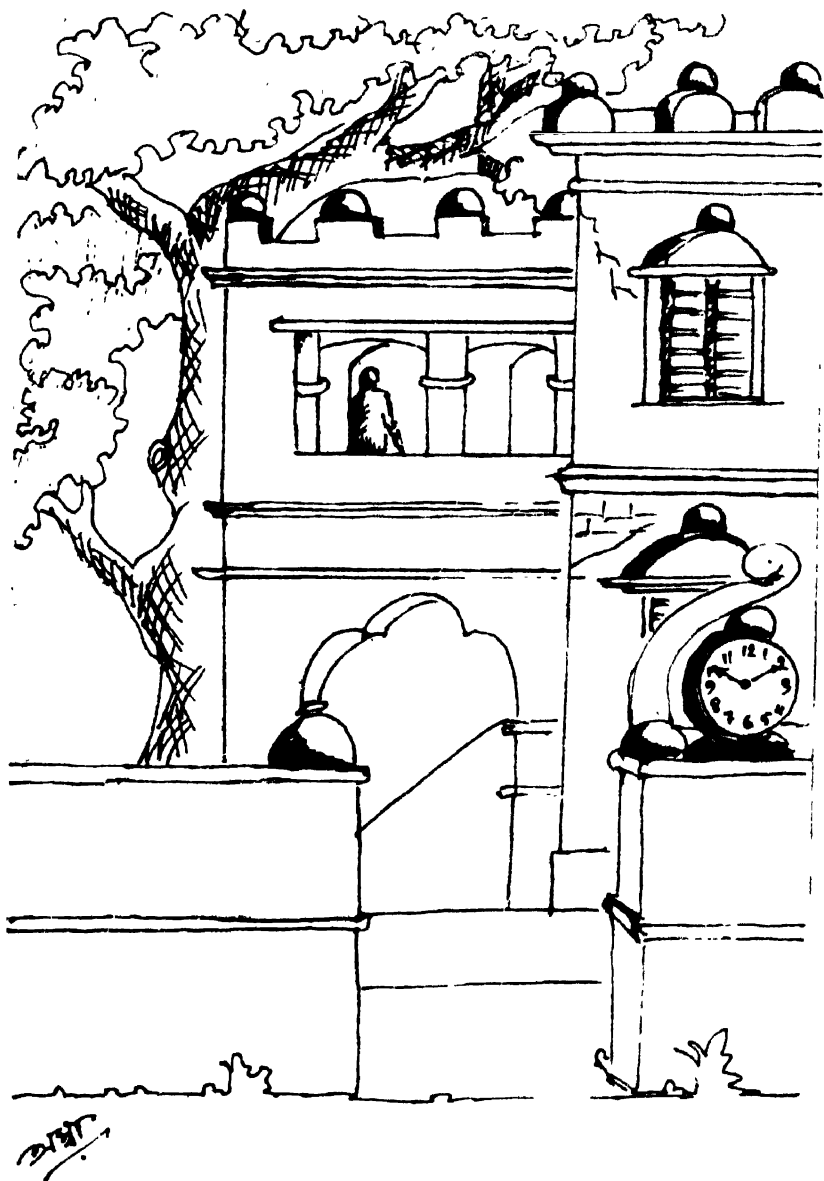
সংসার সাজিয়ে রেখেছে। বাড়ির বাইরের দেওয়ালের দু'ধারে দুটো বড় বড় ঘড়ি। এখন অকেজো হয়ে গিয়েছে। বড় বড় কাঠের কাঁটাগুলো আজও রয়ে গেছে। রাস্তা থেকে দেখা যায়। একসময় এই দুই ঘড়ির ঘন্টার আওয়াজ নাকি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ত। একে সবাই তাই 'ঘড়িবাড়ি' বলে। ভূতের উপদ্রবের কথাও শোনা যায়। তা ভূত না থাকলেও, আদিনাথ থাকে। সন্ধ্যার পর ওর কুপির আলো দেখা যায়।

'ঘড়িবাড়ি'র দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে ঝুর ঝুর করে। জানলা-দরজা চিড় খেয়ে ঝুলে পড়েছে। ছাদ দিয়ে জল পড়ে। বেরিয়ে আসা ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে ইঁদুর, বাদুরের বাসা। সবখানেই কেমন যেন সোঁদা সোঁদা গন্ধ। পাথরের বড় বড় সিঁড়ি। দেওয়ালে রঙ চটে যাওয়া দু'একটা পুরানো ছবি, অস্পষ্ট। এ সবই আদিনাথের প্রাণ। যেভাবে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দেওয়ালে হাত বুলোয়, প্রতিটি ঝুঁকে পড়া ইঁটে বড় আপন করে ভালোবাসার পরশ ছড়িয়ে দেয়, তা দেখে মনে হয় এসব বুঝি আদিনাথের প্রাণের চেয়েও দামি। আদিনাথ নিজের প্রতিও এত যত্ন নেয় না।

(২)

সেদিনটা রবিবার। একটু বেলা অবধি মৌজ করে শুয়ে আছে আদিনাথ। হঠাৎ মোটর সাইকেলের ভট্‌ভট্‌ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। বেশ জোরে আওয়াজ হচ্ছে, ঘরের কাছেই।

ধড়পড় করে উঠে পড়ল আদিনাথ। পাল্লাহীন জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। মোটাসোটা শক্তপোক্ত একটা মানুষকে সে দেখতে পেল। মোটর সাইকেলটা জানলার নিচে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আরও দু'-তিনজন কখন এসে গেছে। একধারে জটলা করে নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করছে। আদিনাথ কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। কিছু বুঝতে পারল না। লোকটা ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একবার পেছন ফিরে তাকাল। আদিনাথের সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল। আদিনাথ কেমন ঘাবড়ে গেল। 'পঞ্চানন ঘোষাল', এলাকার দাগি গুন্ডা। জমির দালালি আর মস্তানি করে বিশাল টাকার মালিক হয়েছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রায় গোটা তিরিশেক খুন করেছে। কখনও বা খুন করিয়েছে। বিপদজনক এই মানুষটা এখানে কেন! কিছুই বুঝতে পারছে না আদিনাথ। পঞ্চানন ওরফে পঞ্চু ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল। আদিনাথকে যেন খেয়ালই করেনি। এক অজানা আশঙ্কায় আদিনাথের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

(৩)

পরের দিন আবার মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনতে পেল। সে এসেছে। এবার আরও পাঁচজনকে নিয়ে। ওদের একজনের হাতে রিং-এ জড়ানো বাদামী রঙের লম্বা ফিতে। একটু পরেই নীল রঙের একটা কাগজ খুলে পঞ্চু তাকে সব বুঝিয়ে দিল। আদিনাথ জানলায় দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছে। তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করছে না। অথচ সবাই জানে, সে-ই এই বাড়ি আর জমি দেখাশোনা করে। তবু ..। সব ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না। পঞ্চানন ওরফে পঞ্চুর কাজ হল, এলাকার যেখানে যত ফাঁকা জমি পড়ে আছে, সেগুলো ভয় দেখিয়ে অল্প টাকায় কিনে নেওয়া। তারপর সেখানে ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরী করে বিক্রি করা। এইভাবেই সে লক্ষপতি,

হয়তো বা কোটিপতি হয়ে গেছে। তবে কি পঞ্চুর লোভের হাত এবার এখানেই পড়ল? শিউরে উঠল আদিনাথ। এ বাড়ি, এ জমি তাদের গর্ব। কত দিনকার বড় বাড়ি। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে একে ঘিরে। লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। আর সে বাড়ি কিনা এবার...? আদিনাথের চিন্তাভাবনাগুলো সব জট পাকিয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

(৪)

খবরটা তাড়াতাড়ি রটে গেল। ব্যারাকপুরের প্রদোষবাবু এ বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন। কিনেছে ঐ পঞ্চু গুন্ডা, প্রায় জলের দরে। এখন এ বাড়ি ভেঙ্গে অনেকগুলো ফ্ল্যাটবাড়ি হবে। তাতে অনেক লোক আসবে। কারা আসবে, তাও নাকি ঠিক হয়ে গেছে। আদিনাথ তার ছোট মাথায় এতগুলো তথ্য ঠিকমত গুছিয়ে নিতে পারছে না। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। "না, না, এ হতে পারে না। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।" আদিনাথ মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল। ছুটে গেল পাড়ারই এক বুড়ো মাস্টারের কাছে। সবকিছু খুলে বলল। তিনি আদিনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল আবেদন করা হবে সবকারের কাছে। পুরানো ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত "ঘড়িবাড়ি", যা এ এলাকার প্রতিটি মানুষের গর্ব, তাকে যেন ভেঙ্গে ফেলা না হয়। আর সে আবেদনের সমর্থনে নিচে সই করে দেবে পাড়ার সব মানুষেরা।

(৫)

অদ্ভুত সাড়া পেল আদিনাথ। বেশ কিছু সই সংগ্রহ করল সে। সই ভরা কাগজটা বুড়ো মাস্টারের হাতে তুলে দিল। "মাস্টারমশাই, এবার এটা গভরমেন্টে পাঠিয়ে দিন। অনেক সই পড়েছে।"

সেদিনই সন্ধ্যায় আদিনাথ ঘরে ফিরে দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল। পা ফাঁক করে পঞ্চু দাঁড়িয়ে আছে। আদিনাথকে দেখে মুখটা কঠিন হয়ে এল। হাতটা পকেটে চলে গেল।

অন্ধকারের মধ্যেও চক্‌চক্ করছে জিনিসটা। ইস্পাতের ফলা। পঞ্চু এগিয়ে এল। বরফের মত ঠান্ডা ইস্পাতের ফলাটা আদিনাথের গলায় রেখে বলল, "এটা কি জানিস?" আদিনাথ বিমূঢ় হয়ে যায়। ফলাটা আরও চেপে বসে। আদিনাথ মুখে কিছু বলল না। শুধু ঘাড়টা একপাশে হেলে পড়ল।

(৬)

পরের দিন সকালে আদিনাথ খবরটা পেল। পাড়ারই লাহিড়ীবাবু একটা পাল্টা আবেদনপত্র নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। তাতে লেখা—এ বাড়ি অত্যন্ত পুরানো ও পরিত্যক্ত। সাপখোপ আর সমাজবিরোধীর আড্ডাখানা। অবিলম্বে এটিকে ভেঙ্গে ফেলা হোক। চোখ বুজে সবাই সই করে দিচ্ছে। আদিনাথ স্পষ্ট বুঝতে পারে। পঞ্চানন ঘোষাল। ইস্পাতের ফলা। বেশ ঠান্ডা।

(৭)

সকাল থেকেই ধার দিয়েছে কুড়ুলটায়। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে দেখে নিচ্ছে কতটা ধার হল। বারে বারে ঘষার ফলে পুরানো কুড়ুলটাও চক্‌চক্ করছে।

(৮)

"দূর দূর, আমার কি? যার বাড়ি, সে-ই বুঝল না। লাহিড়ীবাবুর কাগজে সবাই সই করে দিল। এই তো সব ভদ্দর লোক। এম.এ, বি.এ. পাশ করা ভদ্দরলোক, পেটে বিদ্যে ভস্‌ভস্‌ করছে। বুকে একটুও হিম্মত নেই। আমি আর ক' বছর?"

আদিনাথের চিন্তাভাবনাগুলো মাঝে মাঝেই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, সে একা কি করবে? কেন করবে? আবার ঝুঁকে পড়া নোনা ধরা লাল ইঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা থরথর করে ওঠে। ভেতরে ভেতরে ছটফটিয়ে ওঠে। রোখ চেপে যায়। পাথরের বড় বড় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পলেস্তারা ঝরে পড়া দেওয়ালগুলোতে হাত বুলোতে থাকে। মনটাকে শক্ত করে নেয়। আজই সন্ধ্যায়।

(৯)

পঞ্চু আর একটা লোক পাথরের সিঁড়িটার কাছ দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে কি সব হিসেব-নিকেশ সেরে নিচ্ছে। মোটর সাইকেলটা মাঠের পাশে দাঁড় করানো। অন্ধকার নেমে আসছে। আদিনাথ সতর্ক পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল পেছন থেকে। ওরা হিসেবে মশগুল। সেদিকে তাকিয়ে আদিনাথের চোখটা শেষবারের মত জ্বলে উঠল। ভেতরে ভেতরে পাশবিক জিঘাংসা পাক দিয়ে উঠল। ষাট বছরের শরীরটায় সমস্ত শক্তি এসে মুহূর্তের জন্য জমা হল হাতের মুঠিতে। প্রচন্ড গতিতে ধারাল কুড়ুলটা নেমে এল পঞ্চুর পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা শরীরটাকে লক্ষ্য করে। রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়ে শক্ত-পোক্ত দেহটা লুটিয়ে পড়ল পাথরের সিঁড়িতে। আদিনাথের হিংস্র মূর্তি দেখে পাশের লোকটা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

(১০)

একটু পরেই ওরা ফিরে এল। পঞ্চুর দলের ছেলেরা। একটা ছোট্ট হিস্যা চুকিয়ে ফেলতে। কোমরে সাদা ধুতিটা জড়িয়ে খালি গায়ে আদিনাথ এগিয়ে এল। হাতে এখনও শক্ত করে ধরা চকচকে কুড়ুলটা। পঞ্চুর গরম রক্তে লাল হয়ে আছে। বেপোরোয়াভাবে সেটা দিয়েই সজোরে আঘাত হানল। একজন লুটিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সক্রিয় হয়ে উঠল বাকী ছ'জন। মাথার পেছনে ঘাড়ের কাছটায় একটা প্রচন্ড আঘাত ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া আদিনাথের শরীরটা ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সামনের লোকটা বাঁ হাত দিয়ে ষাট বছরের ঝুঁকে পড়া বিদ্রোহী শরীরটাকে তুলে ধরল। ডান হাতে ধরা লম্বা ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিল তলপেটে। জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে আদিনাথ তলপেটে সেই ইস্পাতের ফলার ঠান্ডা অনুভূতিটা আরেকবার টের পেল। এবার একটু বেশী করেই। রক্তে মাখা একদলা মাংসপিন্ড ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। চকচকে ইস্পাতের ফলাটা আদিনাথের শরীরেই গেঁথে রইল।

(১১)

রক্তে মাখামাখি আদিনাথের তোবড়ানো শরীরটাকে শেষবারের মত দেখার জন্য দোতলার ঝুল বারান্দা চিড় খেয়ে আরও বেশ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে। ওপাশে ঠুক্‌ঠাক্‌ শব্দ হচ্ছে। মিস্ত্রিরা কাজে নেমে পড়েছে। ওদের কাছে 'অর্ডার' আছে।

ঘড়িবাড়িকে সাত দিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

রূপনারায়ণের চরে

'বাপ, তুই ভুল করছিস। আমার কথা শোন্।'

'তুই ব্যাটা হারামি। জানিস্, একটাও পেলে আমাদের...'

'তুই একটাও কোনও দিন পাবি না।'

'আলবৎ পাব। কত লোকে পেয়েছে। আর আমি পাব না?'

'জ্বিদ ছাড় বাপ, জিদ ছাড়। যা বলছি, তাই কর।'

'না, করব না। তোর কথা শুনতে আমার বয়ে গেছে'।

'তুই মরবি বাপ। আমাদেরও মারবি।' হতাশায়, ক্ষোভে জগন্নাথ মাথা ঝাঁকাল। বাপ সাধনের সেই এক গোঁ। সে খুঁজবেই। সে পাবেই।

(২)

সেদিন হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। রূপনারায়ণের হাওয়া খেতে খেতে বাঁধের রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিল। এলোমেলো উদাসী হাওয়ায় ফতুয়ার হাতাটা পতপত করে উড়ছিল। রূপনারায়ণকে ডান ধারে রেখে ফুরফুরে মেজাজে ঘরে ফেরা। বাতাসও জলে ভেজা। বেশ ঠান্ডা। বাঁধের উপর থেকে নিচের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে গেল। মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে গেল ছবিটা। একটা পেশীবহুল মানুষ বারে বারে ঝুঁকে পড়ছে। হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরা লম্বা কোদালটা বারবার মাথার উপর উঠছে। তারপর আবার সবেগে নেমে আসছে মাটিতে। লোকটা খুঁড়ছে। রূপনারায়ণের ঠান্ডা পরশে মাঝে মাঝে শরীরটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য। বড় বড় শ্বাস ফেলে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। পেশীবহুল বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে। বেশ কিছুটা দম নিয়ে, আবার হাত দুটোকে সক্রিয় করে তুলছে। কোদালের এক এক কোপে উপড়ে আসছে বালি, মাটি, কাদা।

জয়দেব জোরে পা চালাল। বাঁধের উপর থেকে সড়সড় করে নেমে এল রূপনারায়ণের চড়ায়। একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সেই পেশীবহুল মানুষটার সামনে।

'ওহে, অমনধারা খুঁড়ছ কেন?'

লোকটা শুনতে পেয়েছে। কোদাল চালানো থেমে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে জয়দেবের দিকে। কালো কুচকুচে মুখটা ঘামে ভিজে চক্‌চক্ করছে। গরম নিঃশ্বাস পড়ছে সশব্দে। চোখ দুটো পাথরের মত। কোনও উত্তর নেই। জয়দেব আরও এগিয়ে এল। এবারে মানুষটার বুকের আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছে সে। পশ্চিমে ঢলে পড়া লাল আলোটা শেষবারের মত জমে আছে মানুষটার তোবড়ানো গালে। ক্লান্তিতে ঝুলে পড়া ঠোঁটটা একটু নড়েচড়ে উঠল। ফিস্ ফিস্ করে কয়েকটা কথা বলে উঠল। অস্তরাগের লাল আভাটা এবার জয়দেবের ফুলো গলাটাও ছুঁয়ে গেল। উত্তেজনায় থর থর করে উঠল সমস্ত শরীর। মণি দুটো জ্বলে উঠল একবার। খুঁজবে, সেও খুঁজবে। সেও পাবে।

(৩)

দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল নেশাটা। সারা গ্রামে যেন সাড়া পড়ে গেল। একে একে হাজির হল সবাই, রূপনারায়ণের তীরে। হাকিমপাড়ার সনাতন, ঘোষপাড়ার মদন, জয়চণ্ডীতলার গগন, পূবপাড়ার আজিজ, বাউরি পাড়ায় নিবারণ, মাঝেরপাড়ার পতিত... দেখতে দেখতে সব্বাই। সবাই খুঁজবে, সবাই পাবে। ঝাঁপানতলার সাধনও আশায় বুক বাঁধে। বউ-ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সে রূপনারায়ণের চড়ায় ছাউনি ফেলল সংক্রান্তির দিন। জয়দেবের মুখ থেকে সেও শুনেছে মাটি খোঁড়ার কথা। রূপনারায়ণের চড়ায় এতগুলো মানুষের স্বপ্ন দোল খাচ্ছে। কার যে কখন কপাল ফেরে, কে জানে। আশায় বুক বেঁধেছে সব্বাই।

ডানধারের ঐ নারকেল গাছটা থেকে এই খুঁটি পর্যন্ত—সাধনের ভাগে পড়েছে এইটুকু। প্রথমে বেশ ঝামেলা হয়েছিল, ভাগাভাগি নিয়ে। হারু ঘোষের লাঠির ঘায়ে পঞ্চার মাথা ফাটল। দীনু আর নিতাই সই পাতিয়েছিল গাজনের মেলায়। সেই চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব ভেঙে

তারা হুমকি দিল পরস্পরকে। খুনের হুমকি, তাতে যে কোনও মুহূর্তে রক্তপাতের ইঙ্গিত। রূপনারায়ণের জোলো হাওয়ায় একটা পাশবিক জিঘাংসা পাক দিয়ে উঠল। শেষে সবাই একমত হল। চূড়ান্ত ফয়সালা চাই। ভাগ্য ফেরাতে হবে সবাইকেই। তাই হয়ে গেল ভাগাভাগি। বাঁশের খুঁটি পুঁতে চিহ্নিত হয়ে গেল ছোট ছোট অংশগুলি। জমাট বাঁধা বালি, তার তলায় কাদা, আরও খুঁড়লে ঘোলা জল। তবু নেশা ওখানেই। মন-প্রাণ-দৃষ্টি গেঁথে আছে ঐ গভীরে। ঘোলা জলে অপ্রকৃতিস্থ মুখগুলো চক্‌চক্ করে। বলিরেখাগুলো দীঘল ভাঁজ ফেলে দেয় মুখগুলোতে। একটা চাপা উদ্বেগ সব সময় জোঁকের মত আটকে থেকে দেহ থেকে, মন থেকে রক্ত-রস শুষে নিচ্ছে। চাই-চাই-চাই। পেতেই হবে। যে করে হোক।

(৪)

'সব্বার আগে আমিই পাব। এ্যাক্কারে পেথম্।'

স্বপ্নটা ধারাল ব্লেডের মত কেটে কেটে বসে যাচ্ছে সবার শরীরে। লোমশ বুকে ঘাম ছোটা কালো মানুষগুলোর সারি সারি মাথা। খুঁড়ছে। বাড়ি-ঘর বিক্রি করে, ঘটি-বাটি বন্ধক রেখে, কোনও রকমে দু'চার দানা পেটে ফেলে, সক্কাল সক্কাল নেমে পড়া, বালির চরে। কখনও বা চুপিসারে রাত বিরেতেও। 'ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্'। শক্তপোক্ত কোদালগুলো নেমে আসছে। শূন্য থেকে মাটিতে।

(৫)

'আমারটা শেষ। নেই, একটাও নেই।'

হতাশায় ভেঙে পড়া গলায় সাধন বলে উঠল। মুখটা আকাশের দিকে তুলে বোধহয় প্রবঞ্চক প্রতারক ভাগ্যদেবীকে প্রত্যক্ষ করতে চাইল, অন্তত একটিবারের জন্য। সেই নিষ্ঠুর নিয়ন্তার মুখোমুখি হতে চাইল সে। মুখোমুখি হলে, ফোস্কা পড়ে যাওয়া হাত দুটো তুলে তাকে একটাই প্রশ্ন করবে সাধন। অনেক ঘৃণা, অনেক জিঘাংসা মিশে আছে সেই প্রশ্নে। থুতু ছেটাবার মত ছিটিয়ে দেবে ভাগ্যদেবীর মুখে। ছাল উঠে যাওয়া আঙুলগুলো ছুঁড়ে, অন্তত একবার সে প্রতিবাদ করবে। ছুঁড়ে দেবে অনেকদিনের জমে থাকা ঘামে ভেজা অনেক অভিযোগ, অনেক অভিমান,...।

'তাতে কি হইছে? আমারটা একটু নিবি?'

বুড়ো হরিদাসের প্রস্তাবে সাধনের চোখদুটো জ্বলে উঠল।

'দিবি?!'

'দেব।'

(৬)

তাঁবুতে ফিরেই সাধন কেটে কেটে বলল, 'পারুটাকে দিয়া আসি।'

বিমলা চমকে উঠল—'কোথায়? কার কাছে?'

'বুড়ো হরিদাসের কাছে।'

'কি বলছো তুমি! পারুকে...'

'বুড়ো জমি দেবে। অনেকটা। পারুকে ছেড়ে দে।' সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠল সাধন।

সেরকমই ঠিক হয়েছে, আজ সন্ধ্যায়। বুড়ো হরিদাস বলেছে, পারুকে পেলে কিছুটা জমি সে ছেড়ে দেবে সাধনকে। আসলে, বুড়োর নেশা কেটে গেছে। বুঝেছে, সে পাবে না। এদিকে পারুটাও ডাগোর-ডোগর হয়েছে। এই সুযোগে খেয়ে নাও চেটেপুটে। বুড়ি গত হয়েছে, তা প্রায় একযুগ তো হয়ে গেল। ছেলে-পুলেরাও বিয়ে-থা করে ভিন্ন হয়েছে। এখন এ বয়সে সেবা করার তো একটা মানুষ চাই। তাছাড়া পুরুষ মানুষের, কি যেন বলে, একা থাকতে নেই। সাধনের মেয়েটাকে দেখতে-শুনতে বেশ ভালই। শেষ বয়েসটা বেশ রসে-বশেই কাটবে, এমনটা ভেবে নিয়েছে বুড়ো হরিদাস। ওদিকে খোঁজার নেশাটা একগুঁয়ে সাধনকে একটা মারাত্মক ছোবল মেরেছে। অবশ করে দিয়েছে তার সমস্ত স্নায়ু, সমস্ত অনুভূতিকে। যেখানে প্রতিযোগিতার তাড়না, পাশের মানুষকে টপকে যাবার উচ্চাশা, সেখানে একটা পর্যায়ে এসে নিজেকে সংযত করা রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সাধন তাই দিয়ে দেবে পারুকে, বুড়ো শকুনটার হাতে।

'আয় আমার সঙ্গে।' পারুর শীর্ণ হাত দু'টোতে একটা হ্যাঁচকা টান পড়ল।

(৭)

'শুনছস্ সাধন, মনু ঘোষ পাইছে, একখান।'

সাধন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বুড়ো হরিদাসের কথাটা ঠিকমত শুনতে পায়নি। উন্মত্তের মত সে খুঁড়ছিল। বুড়োর ঘরঘরে গলার আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেল। নাক দিয়ে হলকা বেরিয়ে এল।

'মনুটা পাইছে।' হরিদাস কথাটা আবার বলল।

'কে পাইছে?' কাঠফাটা রোদে গনগনে চুল্লির মত গরম হয়ে গেছে সাধনের মাথাটা। চিন্তা ভাবনাগুলো ঠিকমত কাজ করছে না। কপাল থেকে ঘামের স্রোত নামছে।

'মনু, মনু ঘোষ। গয়লাপাড়ার ছিদামের ব্যাটা মনু।'

'শালা!' এক ঝটকায় আঙুল দিয়ে কপাল থেকে ঘাম ঝেড়ে ফেলল সাধন। কোদাল শুদ্ধু হাত দুটো আবার শূন্যে উঠে গেল। হিংস্রবেগে নেমে এল মাটিতে। আরও একটু জোরে। এক দলা বালি-মাটি ঝাঁকি দিয়ে উঠে এল। নেই। আরও একবার। এবারও নেই। কিন্তু চাই-ই চাই। ঐ আরেক জন, গয়লাপাড়ার হাভাতে মনু ঘোষ, শালা বরাতজোরে পেয়ে গেল একটা। এই নিয়ে চারজন। তাকেও পেতে হবে। হবেই। উন্মত্তের মত ওঠানামা শুরু করল সাধনের শরীরটা। ক'দিন ধরে অবিরাম চালাতে চালাতে কফোনি বেঁকে গেছে। তবু ক্লান্তি নেই। সবটুকু প্রায় খোঁড়া হয়ে গেছে। শেষ আশা, এই ফুট দুয়েক জমি। এখানেও না পেলে...।

(৮)

'মানুষটা তো এমনধারা ছিল না'। বিমলা ভেবে পায় না কী থেকে কী হয়ে গেল। গর্ভে জগন্নাথ আসার আগে এই মানুষটার সঙ্গেই অনেক সুখের সময় কাটিয়েছে সে। 'তখন কত সোহাগ, কত আদর', অজান্তে মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে নিলাজ ভাবা। সচেতন হয়ে মুখে আঁচল চাপা দেয় সে। ভাগ্যিস জগন্নাথটা এখন তাঁবুতে নেই। কপালে হাত দিয়ে তাঁবুতে পিঠ

ঠেকিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকে বিমলা। খোঁজার নেশায় চাষ-বাস সব লাটে উঠেছে। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না কেউই। কি এক মরণ নেশায় যে পেয়ে বসল মানুষটাকে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে বিমলার।

ওই তো ফিরে আসছে সাধন। ওই তো হাসিতে চক্‌চক্‌ করছে মুখটা। পেয়েছে, সেও পেয়েছে একটা। জিদ সফল হয়েছে।

'এইমাত্র পেলুম গো। এবার আর কোনও ভাবনা নেই।'

নোংরা ধুতিটা হাঁটুর ওপর তুলে বুক ফুলিয়ে হেঁটে আসছে সাধন। হ্যারিকেনের লাল আলোয় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে সাধনের অর্ধোলঙ্গ শরীরটা।

'পারুকে এবার ...' বিমলা কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পারুকে এবার নিয়ে আসব। বুড়ো শকুনটার মুখের উপর টাকার থলেটা ছুঁড়ে দিয়ে, পেছনে একটা...'

উত্তেজনায় কথা শেষ করতে পারে না সাধন।

(৯)

'আঃ!'

ঘাড়ের কাছে একটা প্যাচ প্যাচে ঘামের গন্ধে বিমলার শরীরটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। থেতলে গেল সবুজ অনুভূতি দিয়ে গড়া মাংসল স্বপ্নটা। কল্পনার মায়াজাল ছিঁড়ে সাধনের তোবড়ানো চোয়ালটা বীভৎসভাবে ফুটে উঠল। কখন যে এসে পাশে বসেছে সাধন, খেয়াল করেনি বিমলা। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে কালো হয়ে আসা আকাশটার দিকে চেয়ে সে বিভোর হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্নে, আরেকবার সবকিছু ফিরে পাওয়ার স্বপ্নে ডুব দিয়ে মনের রোগ-শোক-তাপ-জ্বালা—সব জুড়িয়ে নিচ্ছিল নিজের মত করে।

'আঃ! সব শেষ!' সাধনের গলায় ভেঙে পড়ার শব্দ। নেই, কোথাও নেই। 'পেলুম না গো; একটাও কপালে জুটলো না।'

(১০)

'বাপ, হেই বাপ, ওঠ্‌, শিগ্গির ওঠ্‌।'

জগন্নাথের ঠেলাঠেলিতে ধড়মড় করে উঠে বসল সাধন।

'কেন, কি হয়েছে? মাঝ রাত্তিরে...'

সারাদিনের ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল সাধন। ঘুম যেন শুঁয়োপোকার মত চোখ দু'টোকে জড়িয়ে ধরেছে তার।

'চেয়ে দ্যাখ বাপ, মা দড়ি দিয়েছে।'

'অ্যাঁ!'

আতঙ্কে চাবুকের মত ছিটকে দাঁড়াল সাধন। মাথাটা অস্পষ্ট অন্ধকারে ঠক্‌ করে ঠুকে গেল। ঘাড় তুলে দেখল, এক জোড়া পা, বিমলার।

বিমলার চিমসে যাওয়া শরীরটাকে ঘিরে একগাদা মাছি ভনভন করছে। সেদিকে তাকিয়ে

সাধন হড় হড় করে বমি করে ফেলল। বমির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রক্ত ছলকে উঠল। কালচে রক্তের ছিটে লেগে গেল ময়লা ধুতিতে। উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল কোদালটার দিকে। ডানহাতের কড়া পরে যাওয়া হাতের মুঠোয় সেটাকে চেপে ধরে, ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। অন্ধকারে মিশে গেল কালো শরীরটা।

নেশা। বিমলা শেষ। নেশার কোনও শেষ নেই।

(১১)

শ্যাওলা ধরা সোঁদা অন্ধকার নেমে আসছে রূপনারায়ণের চরে। সাধন ফিরে আসছে টলতে টলতে। উত্তেজনায় মুখটা অস্বাভাবিক লাল হয়ে গেছে। নাকের পাটা টা তিরতির করে কাঁপছে। সারা শরীরে বিদ্যুতের মত রক্ত ছুটছে। হাত-পায়ের খাঁজে খাঁজে একটা চমক ওঠা শিহরণ।

'অনেক-অনেক-অনেক টাকা...লাখ লাখ টাকা...' বিড়বিড় করতে করতে সাধন হাঁটছে। তার মধ্যে একটা প্রচন্ড ঝড় উঠেছে, টাকার ঝড়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার ঝড়। সেই টাকার চড়ায় পা গেঁথে যাচ্ছে সাধনের। ডুবে যাচ্ছে সে। কেন্নোর মত তার শরীরটা যেন গুটিয়ে যাচ্ছে। ছাল উঠে ঘা হয়ে যাওয়া ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা গোলমত চকচকে জিনিসটার দিকে সে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে তাকিয়ে আছে। ছুলি ওঠা পচন ধরা আঙুলগুলো দিয়ে রগড়ে রগড়ে তুলে ফেলছে ঐ গোলমত জিনিসটার গায়ে লেগে থাকা বালি-কাদা। জিনিসটার ভেতর থেকে ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে আলো। সে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সাধনের। বাঁধের পাড়ের কচি ঘাসগুলোও যেন চিক্‌ চিক্‌ করছে সেই মায়াবী আলোয়। সাধনের চোখের মণিগুলো উন্মত্ত নেশায় কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাঁবুতে ফিরে এসে সে দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। হাতের মুঠোয় সেটাকে আঁকড়ে ধরে দাঁতে দাঁত চিপে সে সারারাত জেগেই কাটিয়ে দিল।

সূর্যের আলো মুখে-চোখে পড়তেই, জগন্নাথ পাশ ফিরল। আধবোজা চোখে একবার চারিদিকটা দেখে নিল। নেই, তার বাপ নেই। চলে গেছে সে। ভোর হতে না হতেই।

(১২)

ধুতির কাপড়টা দেখে সনাক্ত করল জগন্নাথ।

'হ্যাঁ। ইটা বাপই বটে। এ্যাই তো ঘাড়ের কাছে কাটা দাগটাও।'

দোমড়ানো, মোচড়ানো একদলা মাংসপিন্ড। হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল জগন্নাথ। 'নেশা। খোঁজার নেশা। বাপ্‌টারে নেশায় খাইল।' বলতে বলতে জগন্নাথের ঠোঁট দু'টো ঝুলে পড়ল। বিড়বিড় করে আরও অনেক কিছু বলল। কেউ শুনতে পেল না।

তাঁবুর সামনে ভিড় জমছে। সাধন খুন হয়েছে। কারা খুন করেছে, জগন্নাথ তা জানে। ঐ মোটর সাইকেলে চেপে আসা হারামজাদা মস্তানগুলোর হাতে। শালারা ঠান্ডা মাথায় দালালি করছে ক'দিন ধরে। সাধন গিয়েছিল ওদের ডেরায়। ওইটা বিক্রি করে অনেক অনেক টাকা নিতে। লাখ লাখ টাকা। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে, বুড়ো হরিদাস এসে ঢুকল। চোখে-মুখে বুড়োর

নিষিদ্ধ কৌতূহল।

'সাধন পাইছিল?'

জগন্নাথ মুখ তুলে তাকাল। সাধনের রক্তমাখা নোংরা ধুতিটা বুড়োর মুখের সামনে তুলে ধরল। 'পাইছিল। এ্যাইটা।'

রক্তমাখা কালচে ধুতিটা বুড়োর চোখের সামনে ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছে। নানা রকম রঙ ধরছে তাতে। চক্‌চক্ করছে, হীরের মত। মস্ত বড় একটা হীরে। অনেক...অনেক... অনেক টাকা। রূপনারায়ণের চড়ায় তাঁবু ফেলা মানুষগুলোর স্বপ্ন। হীরে পাবার স্বপ্ন। হীরে খোঁজার নেশা। কে একজন পেয়ে গিয়েছিল দৈবক্রমে। সেই খবর রটে যেতেই গ্রাম ফাঁকা করে সবাই ভিড় জমিয়েছে রূপনারায়ণের চড়ায়। খুঁড়লে আরও পাওয়া যাবে, নদীর চরে লুকিয়ে আছে হীরের খনি। এই হুজুগে, এই রটনায় ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্ কোদাল চলছে নদীর পাড়ে। একা সাধন নয়, আরও অনেক সাধন এসে তাঁবু গেড়েছে বাঁধের কোল ঘেঁসে। সকাল-সন্ধ্যা তারা বুঁদ হয়ে আছে একটা উন্মত্ত নেশায়।

(১৩)

সেদিন শেষ রাতে একটা বীভৎস চিৎকারে চমকে উঠল সবাই। বাঁধের পাড়ে ছাউনি ফেলা মানুষগুলো বেরিয়ে এল যে যার গর্ত থেকে। তাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে দিয়ে জং ধরা কোদালটা মাথার উপর উন্মাদের মত ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে বেরিয়ে গেল জগন্নাথ। রূপনারায়ণের চড়ায় নেমে জলে-কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল। শেষ রাতের সেই আধো অন্ধকারে জলে-কাদায় মাখামাখি হয়ে সে যেন অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির রূপ ধারণ করল। তারপর 'ঝুপ্' করে একটা শব্দ শোনা গেল। নরম বেলে মাটিতে কোদালের কোপ পড়ল।

জগন্নাথ খুঁড়ছে। ওই রকম আর একটা এবার তারও চাই।
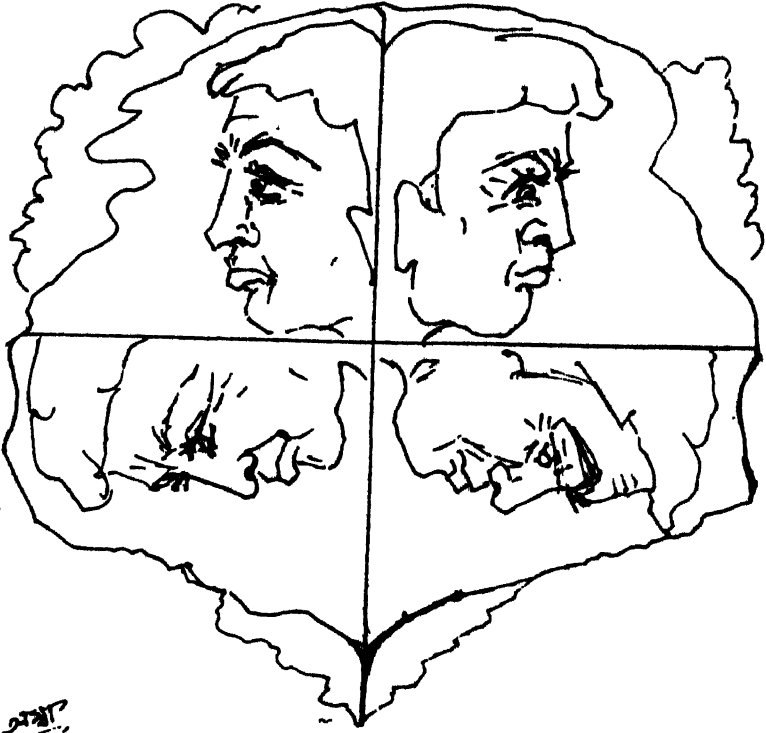
চন্দ্রাহত

বিড়ির স্বাদটা এই প্রথম তেতো তেতো লাগল।

কেন জানি না, আজকাল এরকমই হচ্ছে। মৌলালির মোড়ে প্রাইভেট বাসটাতে প্রচন্ড ভিড়। একবার ভাবলাম, উঠব কি না। বেশিক্ষণ ভাবতে পারি না। পা দুটো অবধারিত ভাবে এগিয়ে গেল। গুঁতোগুঁতি করে ভেতরে ঢুকছি। হঠাৎ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল। চারদিকে যেন কেউ নেই। ধূ ধূ মাঠের মত ছড়ানো শূন্যতা। একা আমি দাঁড়িয়ে। এদিকে ঘাড়ের কাছে তখনও ছ'-সাত জন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। অথচ সে সব টেরই পাচ্ছি না। নিজেকে বড্ড হালকা বলে মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাওয়া বেলুনের মত।

(২)

স্টোর ম্যানেজারের ঘর থেকে ফাইলটা আনতে গিয়ে আবার কী রকম গোলমাল হয়ে

গেল। কাঁচের টেবিলের উপর কালির দোয়াতটা বড্ড চোখে লাগছে। ম্যানেজারের নাকের উপর মোটা ফ্রেমের চশমা। গালে দু'-চারটে পুরনো ব্রণর দাগ। একটা সবুজ রঙের মাছি এসে বসব বসব করছে সেই গালে। কিন্তু সেদিকে হুঁশ নেই মিস্টার দেশাইয়ের। ঘাড় গুঁজে হাত চালাচ্ছেন ঝড়ের গতিতে। আমার ভেতরও একটা ঝড় গুম গুম করছে। হাত দুটো আমার নিশপিশ করছে। ঐ কালির দোয়াতটা আমার চাই। এই মুহূর্তেই। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম। চেয়ে নিতে পারি। কিন্তু নেব না। কাঁপুনি ধরা হাত দু'টো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। স্টোর লেজারে গুঁজে থাকা মাথাটা একবার সোজা হল। আমি ঝট্ করে হাত সরিয়ে নিলাম।

'এনি থিং মোর?'

'নো। ওকে স্যার।' গলা দিয়ে কথা বের হতে চায় না। ফিস্‌ফিস্ করে বললাম। ব্যস্ত মাথাটা আবার লেজারের ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি মরিয়া। ওটা আমার চাই-ই। বুঝতে পারলাম, হাত দুটো বেশ কাঁপছে। চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসছে। ছুঁচ বেঁধে, এমন অন্ধকার চারদিকে। শুধু ঝলমল করছে ঐ কালির দোয়াতটা। সতর্কভাবে মুহূর্তের মধ্যে টেবিল থেকে দোয়াতটা তুলে নিলাম। চওড়া হাতের চেটোয় কায়দা করে লুকিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। ফাইলটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে, পা চালিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। ব্যাস্, আর কেউ দেখতে পাবে না আমাকে। আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। বেসিনের উপর ঝোলানো আয়নাটার দিকে চোখ চলে গেল। কিন্তু নিজেকে দেখতে পেলাম না সেখানে। সেই সবুজ মাছিটা এসে বসেছে আয়নার কাঁচে। সহস্রচক্ষু মাছিটা আমার মুখটাকে ঢেকে রেখেছে। হ্যাঁচকা টান মেরে দোয়াতের ছিপিটা খুলে ফেললাম। অর্ধেকটা কালি বেসিনে ফেলে দিলাম। চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল। প্যান্টের চেন খুলে প্রস্রাব করে ফেললাম ঐ কালির দোয়াতে। দোয়াতটা আবার ভরে উঠল। দাঁত চিপে ছিপিটা বন্ধ করে দিলাম। ফিরে এলাম আবার স্টোর ম্যানেজারের ঘরে।

'এনি থিং মোর?'

'নেক্সট ফাইলটা নেব, স্যার।'

'ওকে, টেক ইট্।'

'থ্যাঙ্কু স্যার।'

অনাবশ্যক ভাবে আরেকটা ফাইল নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কালির দোয়াতটা আবার রেখে এসেছি। ঐ টেবিলেই। আগের মত। সাবধানে, সতর্কে। চোখ দুটো আরেকবার জ্বলে উঠল। সবুজ মাছিটাকে আবার দেখতে পেলাম। দেশাইয়ের গালে এসে বসেছে।

(৩)

পুরসভার ট্যাক্স বাড়ছে হু হু করে। একটা প্রতিবাদ দরকার, সাধনবাবু বলছিলেন। পুরসভা থেকে অভিযোগ জানাবার 'ফর্ম' দিচ্ছে। সেটা ফিল-আপ করতে হবে। অফিস ছুটি নিয়ে, স্নান-টান সেরে বেশ সকাল সকাল হাজির হলাম পুরসভার অফিসে। ফর্ম দেবার কাউন্টারে দিলীপ। আমাদের পাড়ারই ছেলে। বেশ কয়েক বছর মিছিলে পা মেলাবার পুরস্কার।

"এই নিন দাদা, ফিল-আপ্ করুন।'

'দাও। ভাল আছ?'

'ঐ চলছে টেনে-টুনে। তা আপনার কত বাড়ল, দাদা?'

'আর বোলো না। প্রায় ডবল। এবার একটা...'

দ্রুত গতিতে ফর্ম ফিল-আপ করছি। সব ক'টা ঘর প্রায় ভর্তি করে ফেলেছি। এবার নিচের সইটা। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা উল্টে গেল। নাঃ! কিছুতেই মনে করতে পারছি না আমার নামটা। কি নাম আমার? হরিপদ? নিরাপদ? রামমোহন? মোহন সিং? ওফঃ! কি অসহ্য যন্ত্রণা। কিছুতেই মনে পড়ছে না। মাথার ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অসহায়ের মত দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পা দুটো ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছে। কোমরের কাছটা ভেজা ভেজা লাগছে। সেই সবুজ মাছিটা...।

'কি চন্দ্রনাথদা, হল?'

মনে পড়েছে। মনে পড়েছে এবার। আমার নাম চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, চন্দ্রনাথই তো। হুড়মুড় করে নামটা লিখে ফেললাম। চন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ... পদবীটা? মাথাটা একদম কাজ করছে না। কুল কুল করে ঘামছি। মণি দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দিলীপের জামার দুটো বোতাম খোলা। প্রচন্ড গরম। ভেতরে স্যান্ডো গেঞ্জি নেই। লোমশ বুকটাকে পোষা সাপের মত জড়িয়ে আছে সাদা পৈতেটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৈতে। আমারও একটা পৈতে আছে। আমি ব্রাহ্মণ। তাহলে ব্যানার্জ্জী না চ্যাটার্জ্জী? গাঙ্গুলি, চক্রবর্তী, মুখার্জ্জী...।

কী আশ্চর্য! এটুকুও মনে করতে পারছি না।

'লেখা হয়ে গেছে?' দিলীপ তাড়া দিল।

আমি ঘামছি, দরদর করে। ঐ যা হোক একটা হবে। হয় চ্যাটার্জ্জী, নয়ত...। জড়িয়ে পেঁচিয়ে হিজিবিজি করে ওরকমই কিছু একটা লিখে দিলাম। ফর্ম বাতিল হলে হবে। দরকার নেই। আমি বাড়ি যাব। এখুনি বাড়ি যাব। আমার ব্যাগের উপর আমার নাম লেখা আছে। এখুনি সেটা পড়তে চাই। নাম ছাড়া বেঁচে থাকা অসহ্য।

(৪)

আমার নাম সাত নম্বরে। চার ফুট বাই তিন ফুট টেবিলটার সামনে একটা মোটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন ডঃ সেন। রোগী দেখছেন স্টেথো ঝুলিয়ে। চেয়ারটা কাঠের, তাতে গদি লাগানো। টেবিলের উপর সানমাইকা, নিচটা পালিশ। ডঃ সেন আমাদের পারিবারিক ডাক্তার। বহু বছর ধরে পরিবারের সবাইকে দেখে আসছেন। বেশ সদাশয়, মিষ্ট ভাষী ভদ্রলোক। অমায়িক ব্যবহার তার সবচেয়ে বড় 'কোয়ালিফিকেশন্'। আমি এসেছি ডঃ সেনের কাছে। আমি অসুস্থ। পুরসভার দিলীপ ভাল আছে। কিন্তু আমি ভাল নেই। আমি মানসিক ভাবে অসুস্থ। মাথার ভেতর একটা নতুন কারখানা খুলেছে। ভারি অদ্ভুত তার কাজকর্ম। কিছুই বুঝতে পারি না। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়।

ডঃ সেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রোগী দেখছেন। ডান পাশে ভিউ বক্সে একটা বাচ্চা ছেলের মাথার খুলির ছবি। হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমার মাথাটা আবার কেমন ঝিমঝিম করে

উঠল। কনসার্ট বেজে উঠল কানের পাশে। সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকাতে পারছি না ভয়ে। গোলগাল চেহারার ভাল মানুষ ডাক্তারের মুখটা যেন পাষন্ডের মত লাগছে। ডাক্তারের চোখ দুটোতে হিংস্রতার ছায়া। যেন এক মূর্তিমান শয়তান, আমাকে তাড়া করেছে। এখুনি ধরে ফেলবে। আমি সাত নম্বরে। আর মাত্র দু'জন বাকি। বাঁ পাশে তাকের উপর সাজিয়ে রাখা ওষুধগুলো জ্বল জ্বল করছে। কোম্পানিগুলো থেকে দিয়ে যাওয়া স্যাম্পেল ওষুধ। আমি জানি, ওগুলোর কয়েকটাতে বিষ আছে। 'পয়জ্যন' শব্দটা লাল কালিতে লেখা আছে শিশিগুলোর গায়ে। বিরাশি বছর বয়সে ঠাকুমা'র মৃত্যুর পর ডাক্তার বলেছিলেন, 'এভাবে কষ্ট সয়ে, নির্জীবের মত বেঁচে থাকার চেয়ে চলে গেলেন, এই ভাল হল। উনিও শান্তি পেলেন।' আমি মানসিক সুস্থতা হারিয়েছি। বাকি জীবন আমাকেও নির্জীবের মত কাটাতে হবে। ডাক্তার বলেছিলেন...আমি জানি, আমার মত একজন নির্জীবকে শান্তি দেবার জন্য ঐ ডাক্তার আমাকে মেরে ফেলবে। খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে সাদা কাগজে লিখে দেবে মৃত্যুর পরোয়ানা। তাকের উপর সাজিয়ে রাখা ঐ জ্বলজ্বলে ওষুধগুলো কোনও একটার নাম লিখে ধরিয়ে দেবে হাতে। তারপর আমিও শান্তি পাব, ঐ এক্সরে প্লেটে তোলা খুলির ছবির মত। আমার মাথাটা রক্ত মাংসহীন হয়ে যাবে। অখন্ড শূন্যতায় চিরন্তন শান্তি...। অসম্ভব! আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচব। ঐ ডাক্তারের সব চক্রান্তকে দু'হাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে...। টের পাচ্ছি, স্নায়ুসূত্রগুলি দাপাদাপি করছে। ঘূর্ণিঝড়ে আগ্নেয়গিরির ঢাকা খুলে গেছে। আতঙ্কে নীল হয়ে ওঠা মুখ দিয়ে গরম বাষ্পের মত ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বিদ্যুতবেগে উঠে দাঁড়ালাম আমি। সমস্ত শক্তিকে হাতের মুঠোয় জড়ো করলাম। তাকের উপরের লাল-নীল ওষুধগুলোকে এক আঘাতে চুরমার করে দিলাম। আমি বাঁচব। তাই চেয়ার-টেবিল উল্টে দিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে গেলাম ডাক্তারের চেম্বার থেকে। বের হবার সময় চোখে পড়ল, সবুজ সহস্রচক্ষু এসে বসেছে ভাঙা শিশিগুলোর উপর।

(৫)

বানী আমার ছেলেবেলার বান্ধবী। ছেলেবেলার সেই বান্ধবীকে বড় বেলায় প্রেম নিবেদন করেছি কোনও রকম রাখ-ঢাক না করেই। এক ধরনের মেয়ে আছে, যাদের ভালবাসা আমার মত ছেলেদের অপরাধ। রানী সে দলের নয়। ও বড় সাধারণ। দেশী গোলাপ জলের মত। রোজ সন্ধ্যায় ময়দানের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াই দু'জনে। উদ্দেশ্যহীন পথ চলা। তবু তাতেই এই গ্রহে বেঁচে থাকার নতুন লক্ষ্য খুঁজে পাই। এক ভীষণ ভালোলাগার অনুভূতিতে তখন ডুবে থাকি। কখনও নিরিবিলিতে নিঃশব্দে ঝালমুড়ির ঠোঙা নিঃশেষ করি। তারপর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি পরস্পরের দিকে। দু'জনের শ্বাস-প্রশ্বাস বড় কাছাকাছি চলে আসে। হারিয়ে যাই একে অন্যের মধ্যে। আবার কখনও দু'জনে দু'মুখো হয়ে একই স্বপ্ন দেখি। ভালবাসার স্বপ্ন, ঘর বাঁধার স্বপ্ন। পাখিদের মত।

আজও দু'জনে হেঁটে চলেছি, গা ঘেঁসাঘেঁসি করে। রানীর খুব কাছাকাছি আসতে চাইছি আজ। মিষ্টি মেয়েলি গন্ধে ফুসফুস ভরিয়ে নেবার অবসর খুঁজছে মন। আচমকা মাথার ভেতরে
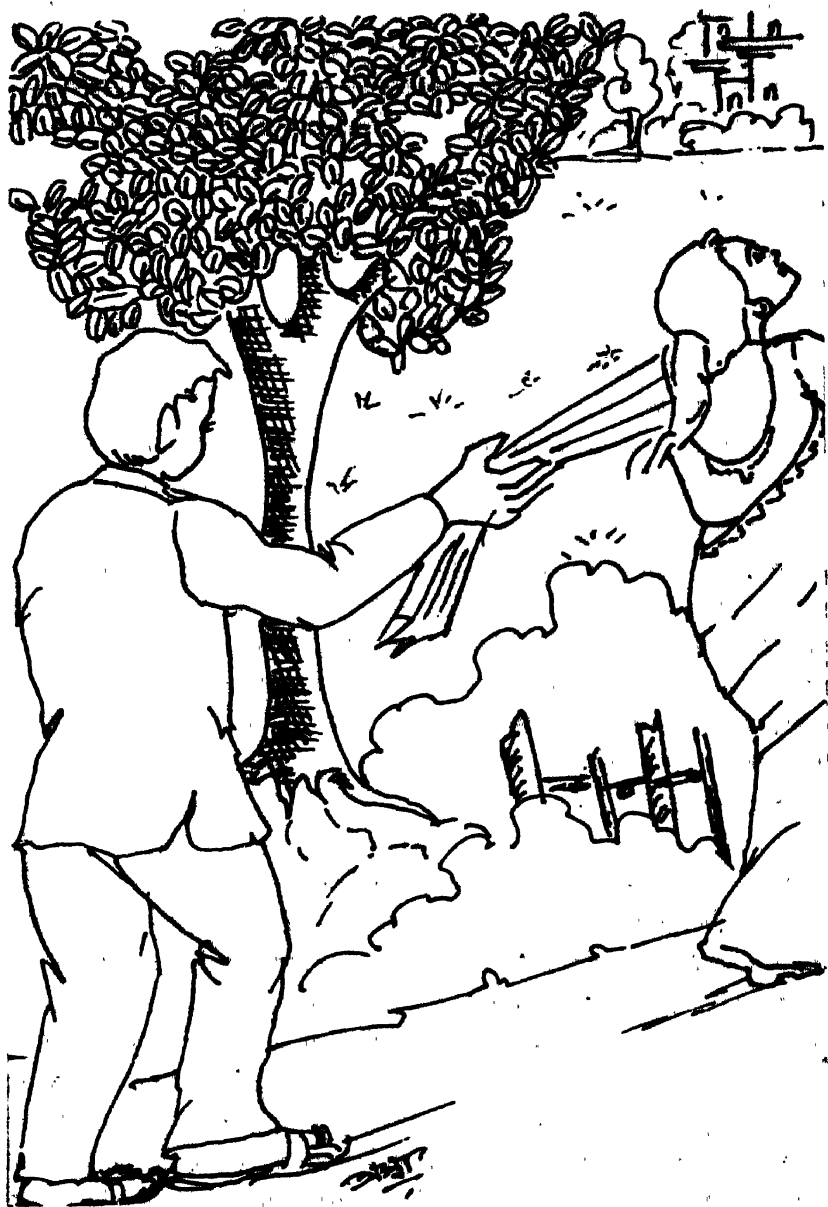
সবকিছু থরথর করে কেঁপে উঠল। সেই নতুন গজিয়ে ওঠা কারখানাটা আবার কাজ শুরু করে দিল। চারপাশের সবুজ অন্ধকার ক্রমশ ভেঙে-চুরে যাচ্ছে। মিষ্টি মেয়েলি গন্ধের ঝাঁঝে চোখমুখ জ্বালা করছে। কেমন যেন নোনতা নোনতা লাগছে সব। গত কয়েকদিন যা খেয়েছি, সব যেন পাক দিয়ে উঠল। বমি করে ফেলব আমি। রাণীর শাড়ির আঁচলটা আঁকড়ে ধরলাম। জোরে টান দিলাম। খুলে এল কিছুটা।

'আঃ, কি হচ্ছে! ছাড়ো, অসভ্য কোথাকার।'

কথাগুলো আমার ভেতরে কোনও ছাপ ফেলতে পারল না। আমি কাপড় ধরে টেনে চললাম।

'কী হচ্ছে কী। আমার সুড়সুড়ি লাগছে যে। একি! কি করছ? তুমি কী পাগল হয়ে গেলে!'

আমি আমার রানীর বস্ত্রহরণ করছি। খোলা ময়দানে। রাতের অন্ধকারে। পুরো শাড়িটা খুলে আমার হাতে চলে এল।

সহসা একটা শক্ত আঘাত আমার চোয়ালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুটা টের পেলাম, কিছুটা নয়। তারপর আরও বেশ কিছু মুষ্ঠাঘাত। সেভাবে যন্ত্রণা অনুভব করার আগেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম।

ঠোটের কোণে নোনতা রক্তের স্বাদ নিয়ে খানিক পরে জেগে উঠলাম। ওরা চলে গেছে। রানীর ভয়ার্ত চিৎকারে ওরা ছুটে এসেছিল, রানীকে বাঁচাতে। রানীর শাড়িটা এখনও আমার হাতের মুঠোয় জড়ানো। ওরা রানীকে নিয়ে গেছে। রানী বাঁচেনি। এক ছোট পাগলের নাগাল এড়িয়ে বড় কোনও পাগলের আড্ডায় ধরা পড়েছে। তারা আরও উঁচু জাতের পাগল। রানীর প্রায় বিবস্ত্র শরীরটাকে তারা কুরে কুরে খেয়েছে। সংজ্ঞা হারানোর পূর্ব মুহূর্তে আমি রানীর অনাবৃত বুকের উপর সেই সবুজ মাছিটাকে বসতে দেখেছিলাম। সেই সহস্রচক্ষুও রানীকে আড়াল করতে পারেনি।

(৬)

খিদিরপুর থেকে বাসে ফিরছি। প্রায় ফাঁকা বাস। বসার জায়গা পেয়েছি। দু'চারজন মাত্র দাঁড়িয়ে। উল্টোদিকে লম্বা লেডিস সিট। এক কোণে মোটাসোটা মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলা। চেহারা দেখে বোঝা যায়, এককালে বেশ সুন্দরী ছিলেন। পাশে তার বছর ছয়েকের শিশুকন্যা। গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি একটু হাসলাম। ভেবেছিলাম, সেও হাসবে। কিন্তু না, তার মুখে কোনও হাসির রেখা ফুটল না। আমি একটু অপ্রস্তুতে পড়ে খানিকক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে রইলাম। তারপর আবার চোখাচুখি হয়ে গেল। এবার একটু আস্তে আস্তে ঘাড় দোলাই। বাচ্চা মেয়েটা এবারও নিষ্পলক। একদৃষ্টে তখন থেকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অবাক চোখে গভীর ভাবে আমাকে নিরীক্ষণ করছে। আমার ভেতর থেকে কি যেন খুঁজছে। আমি জানি, ও কি খুঁজছে। আমি রোগগ্রস্ত। মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছি আমি। ঐ চোখদুটো আমাকে চিহ্নিত করে দিচ্ছে — 'ওই লোকটা পাগল। ওই লোকটা অসুস্থ। ওই লোকটা...।'

ভেতরে ভেতরে একটা পাশবিক প্রবৃত্তি পাক দিয়ে উঠল। ও কে? আমাকে 'পাগল' বলে চিহ্নিত করার দুঃসাহস পেল কোথা থেকে? আমি পাগল নই। আমি মানসিক সুস্থতা হারাইনি। আমি স্বাভাবিক, আমি সুন্দর। কিন্তু ঐ ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো কি খুঁজছে? আমার ভেতর কেন ঢুকতে চাইছে? আমি কিন্তু ওকে আর কিছু খুঁজতে দেব না। আমাকে জানতে দেব না। আমার অসুস্থতা আমার 'প্রাইভেসি', 'মাই অ্যাসেট্'। চোরের মত শিশুটা তাতে হাত বাড়াচ্ছে। রগের শিরাটা দপ্ দপ্ করে উঠল। দেখতে দেখতে চারপাশটা অন্ধকার হয়ে গেল। ছুঁচ বেঁধানো অন্ধকারে চিক্ চিক্ করছে ঐ কচি মুখটা। একটা নতুন গন্ধ, অনেকটা সাপের বিষের মত। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে আমি শেষ করে ফেলব। শক্ত হাতের মুঠিতে ওর ফর্সা নরম গলাটা চেপে ধরলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। একটা প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তিতে চলন্ত বাস থেকে ছিটকে পড়লাম রাস্তায়।

ল্যাম্প পোস্টে পিঠ ঠেকিয়ে কতক্ষণ বসে আছি, জানি না। আমার মুখের সামনে অনেকগুলো সবুজ মাছি উড়ছে। চাপ চাপ রক্তে পাঞ্জাবির কলারটা একেবারে ভিজে গেছে। মাথার পেছনদিক থেকে রক্ত গড়িয়ে ঘাড় বেয়ে পিঠে নামছে। পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত একটা গ্যাস বুকে-পিঠে জমাট বেঁধে আছে। হঠাৎ শরীরের ভেতর থেকে একটা প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। সেই ঝাঁকুনিতে অনেক দিনের জমে থাকা সেই বীভৎস গ্যাসটা চোখ-নাক-মুখ দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এল। শেষবারের মত কুলকুল করে ঘেমে উঠলাম আমি। এবারে চিন্তাভাবনাগুলা ক্রমশ টানটান হয়ে উঠছে। চোখের সামনে উল্টে যাওয়া পৃথিবীটা ক্রমশ সোজা হয়ে আসছে। আমি মানসিক সুস্থতা ফিরে পাচ্ছি। পাঞ্জাবির পকেট থেকে লাল সুতোর বিড়ির বান্ডিলটা বের করলাম। একটা ধরালাম।

নাঃ। এখন আর তেতো তেতো লাগছে না।

নিয়তি

'ওকে তুমি বাঁচাতে পারবে না হে। বারে বারে এই একই প্রশ্ন করে কোনও লাভ আছে কি?'

চোখের দৃষ্টিটা আরও ভয়ানক হয়ে উঠছে। নীলমাধব আর কথা না বাড়িয়ে শুকনো মুখে সরে পড়ে।

আমরা তখন উল্টোদিকের রোয়াকে বসে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছি। নীলুদা'কে দেখে বড্ড মায়া হল। তপন গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'ও বড়দা, একবার এদিকে আসুন না। একটু হয়ে যাক।'

ভজু বুঝতে পেরে কেটলি থেকে আরও এক ভাঁড় চা এগিয়ে দেয়।

'না রে তপা, আজ আর নয়।'

গরম ভাঁড় থেকে উঠে আসা ধোঁয়ায় একটু একটু করে অস্পষ্ট হয়ে যায় নীলুদার কালো

মাথাটা।

'কার মুখ দেখে উঠেছিল, কে জানে। দিনটাই ওর বোধহয় মাটি গেল।' সন্টেটার মুখও কেমন যেন দুঃখী দুঃখী হয়ে যায়। সামনের দিকে চেয়ে দেখি 'শুভার্চন'-এর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সবুজ পাল্লার মাঝামাঝি, একটু ডানদিকে ঘেঁসে গৃহকর্তার নামটা লেখা আছে—নিবারণ চক্রবর্তী, জ্যোতিষার্ণব। লাল রঙ দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা।

(২)

মাথাটা বেশ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে। ভ্রূ জোড়া কুঞ্চিত হয়েছে। টান টান করে ধরে রাখা শিরোরেখার উপর প্রখর চোখের দৃষ্টিটা কিছু একটা গভীরভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা ছোট দ্বীপ চিহ্ন। সরু সুতোর মত একটা ত্রিকোণ ভাঁজ। জ্যোতিষার্ণবের তীব্র দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠছে নিবারণ চক্রবর্তীর।

'বুঝলে দীনু, এ হল পাপ। তোমার পাপের শাস্তি। নিয়তি। কেউ খণ্ডাতে পারবে না। কেউ-ই না।'

দীননাথের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চ্যাপ্টা ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিল। দীননাথের ডান হাতটা জ্যোতিষার্ণবের শক্ত হাতের মুঠির মধ্য থেকে ছাড়া পেয়ে কেমন নেতিয়ে পড়ল।

'আ-আ-আমার কি...?'

'তোমার শিরোরেখায় উন্মাদনার চিহ্ন। আর ছ'মাস। তারপর তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে।'

জ্যোতিষার্ণব নিবারণ চক্রবর্তীর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। তার ভারী গলার অমোঘ বিধান দীননাথের কানে কেটে কেটে ঢুকে যাচ্ছে।

স্তম্ভিত দীননাথ কিছুক্ষণ পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল। তারপর নিবারণ চক্রবর্তীর পায়ে আছাড় দিয়ে পড়ল। 'ঠাকুরমশাই, যা হোক একটা বিহিত করুন। তাবিজ, কবচ, মাদুলি...কিছু একটা দিয়ে আমাকে রক্ষা করুন। সব পাপ স্বীকার করে, আমি মা বিশালাক্ষীর থানে পুজো দেব; যত দামী রত্নই হোক, আমি তা ধারণ করব, ঠাকুরমশাই। আপনি আমাকে শুধু আদেশ দিন।'

নিবারণ চক্রবর্তীর এসব সহ্য হয় না। তিনি বাম হাত দিয়ে দীননাথকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে, পায়ে খড়ম পরে বৈঠকখানা ত্যাগ করে অন্দরমহলে চলে গেলেন।

'নিয়তি, অলঙ্ঘ্য নিয়তি। বিধির বিধান। একে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না।' অন্দরমহল থেকে নিবারণ চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। শুনে জ্যোতিষার্ণবের বৈঠকখানার দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, সামনের দিকে দু'পা ছড়িয়ে অনেকক্ষণ হতাশ মুখে বসে রইল দীননাথ।

(৩)

সময় ছুটে চলে। এই ক'টা মাস যেন বড় তাড়াতাড়ি কেটে গেল। আমাদের নিত্যদিনের আড্ডা বসে কোলেদের রোয়াকে। বেকার জীবন। চাকরি-বাকরি পাচ্ছি না। দিন দিন দল ভারি

হচ্ছে। রত্নার ভাই বিশেটাও জুটেছে দিনকতক হল। বি.কম. দিয়ে বছর তিনেক বিস্তর ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত এই রকে। দীনু দা' ওদের পাশের বাড়িতেই থাকে। মাঝে মধ্যেই দেখতে পাই, গাড়ি করে বড় বড় সব জ্যোতিষীরা আসেন। বড়লোক জ্যোতিষী, নামজাদা জ্যোতিষী, তাদের একেক জনকে দেখতে একেক রকম। কাউকে দেখে বেশ ভয় হয়—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। শরীরের যেখানে-সেখানে বড় বড় তিলক আঁকা। গলায় বেশী ভারি ওজনের রত্নরাজির মালা, কব্জিতে রুদ্রাক্ষ। চোখগুলো টকটকে লাল। বুঝতে পারি, ব্যাটা নেশা করেছে। কিন্তু দীনুদা'দের বাড়ির মানদা ঝি বলে, 'মন্ত্রপূত চোখ'। আবার কাউকে দেখলে মনে মনে বেশ ভক্তি হয়। মনে হয়, হ্যাঁ, ইনি বোধহয় সব পারেন। দীনুদাকে ইনিই বাঁচাবেন।

আবার এক এক জন অতি সাধারণ। দেখে কোনও রকম ভয়-ভক্তি জাগে না। বিশ্বাস করতে চায় না মন। বলে উঠি, 'দোর্, দোর্, এ আবার কী করবে। হাতি-ঘোড়া গেল তল, আর এ কিনা বলে...।'

শুনে মানদা ঝির চোখগুলো বড় বড় হয়ে যায়। 'ও কথা বোলো না গো। জানো, ইনি কত বড় ইয়ে...একবার দর্জিপাড়ার এক ভদ্রলোকের মেয়েকে...।' একটা বেশ রঙচঙে মশলাদার গল্প বলে, ঐ জ্যোতিষীর উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকায়।

আমরা বিশেষ কিছু বলি না। শুধু দেখে যাই। বেচারা দীনুদা'। চেষ্টা করছে বহুৎ। তা করুক না। যদিও আমাদের বিশ্বাস, নিবারণ চক্রবর্তীর গণনা কখনও মিথ্যা হবার নয়। তবু সত্যিই যদি কোনওভাবে নিয়তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়... চেষ্টা করে একবার দেখুক না দীনুদা। নিজেকে কে না বাঁচাতে চায়।

এরই মধ্যে গণা এসে খবর দিল, দু'একজন জ্যোতিষী নাকি নিবারণ চক্রবর্তীর সন্দেহকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা নাকি হাসতে হাসতে বেশ জোর দিয়েই বলে গেছেন, পাগল হয়ে যাবার কোনও চিহ্নই নাকি দীনুদা'র হাতে নেই। 'ও বামুন কিস্যু জানে না। ভুল-ভাল বকে।' বলাই বাহুল্য, আমাদের জ্যোতিষার্ণবের উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলা। আমরা বেশ কিছুটা ধন্দে পড়ে যাই। এ সব কথা ঠাকুরমশাইয়ের কানেও গিয়ে পৌঁছায়। জ্যোতিষার্ণবকে আমরা 'ঠাকুরমশাই' বলেই ডাকি।

গণাই সেদিন ঠাকুরমশাইয়ের বৈঠকখানা ঘরে কথাটা পাড়ল। হাঃ হাঃ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন জ্যোতিষার্ণব নিবারণ চক্রবর্তী। হাসি আর যেন থামতেই চায় না। হাসির ধমকে জ্যোতিষার্ণবের বুকের মাঝখানটা ফুলে ফুলে উঠছে। খালি গায়ে, ধুতি পরে পদ্মাসনে বসেছিলেন। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট হবেন। চওড়া বুকের পেশীকে মোটা উপবীতটা যেন পোষা সাপের মত জড়িয়ে ধরে আছে।

'ওরা তাই বলেছে বুঝি? হাঃ হাঃ, তা বেশ বেশ।'

নিবারণ চক্রবর্তীর ভারী গলার হাসিতে গমগম করে ওঠে পুরো ঘরটা। এ হাসি আর দশটা হাসির মত সংক্রামক নয়। শুনলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। গণার মুখটা ছোট হয়ে গেল।

হাসির গর্জনটা হঠাৎ থেমে গেল। জ্যোতিষার্ণবের চোয়ালটা অসম্ভব কঠিন হয়ে উঠল। চোখের উপরে মোটা ভ্রূ জোড়া যেন অল্প অল্প কাঁপতে লাগল। ঋজু দেহটা কেমন পাহাড়ের মত নিষ্কম্প হয়ে গেল। যেন হাজার শক্তিতেও আর টলানো যাবে না। দেখে আমাদের বুকটা কেঁপে উঠল। জ্যোতিষার্ণবের দৃষ্টিটা ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। সবাই বলে ব্রাহ্মণত্বের তেজটা এখনও চক্রবর্তীকে ছেড়ে যায় নি। একালে সেটা অবিশ্বাস্য হলেও, কেন জানি না যে বিশ্বাস মনের মধ্যে জোর করেই থেকে যায়। আসলে, নিবারণ চক্রবর্তী সজ্ঞানে কোনওদিন মিথ্যাচার করেছেন বলে কারও জানা নেই। 'সততা' আর 'নিষ্ঠা'—বিলুপ্তপ্রায় এই শব্দ দুটোকে তিনি আজও নিজের মধ্যে ধরে রেখেছেন। ধর্মাচরণের প্রতিটি নিয়মকানুন, আচারাদি যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে পালন করেন তিনি। বিবাহ করেন নি, ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে যাবেন বলে। জীবনটাকে গড়ে তুলেছেন ঋজু পর্বতের মত। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, নিবিড় গাম্ভীর্য, সত্যবাদিতা আর জ্যোতিঃশাস্ত্রের গভীর চর্চা ঠাকুরমশাইকে জ্যোতিষ বিদ্যায় পারঙ্গম করে তুলেছে। এ বয়েসেও প্রতিদিন তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিবিড় অনুশীলনে ডুবে থাকেন। তাঁর পাথরের মত কঠিন মুখটা দেখে সত্যিই ভয় ধরে যায়। আত্মবিশ্বাস নিবারণ চক্রবর্তীর সবচেয়ে বড় শক্তি। গণনায় তিনি কখনও ভুল করেন না। এ তাঁর নিজেরও বিশ্বাস। কথায় কথায় তা তিনি প্রকাশও করে ফেলেন। হয়ত এটা তাঁর অহঙ্কার। তবু তেজী বামুনের অহঙ্কারও শোভা পায়।

'দীনুর শিরোরেখায় দ্বীপ চিহ্ন। মস্তিষ্কপ্রদাহ হেতু উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ। নিয়তি। অলঙ্ঘ্য নিয়তি। নিয়তিকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। কেউ না। নিবারণ চক্রবর্তীর গণনা কখনও মিথ্যা হয় না।'

অখন্ড আত্মবিশ্বাসে ভরা জ্যোতিষার্ণবের থমথমে কণ্ঠস্বরে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। নিঃশব্দে বৈঠকখানা থেকে আমরা উঠে পড়ি। ফিরে যাই কোলেদের রোয়াকে। কিন্তু সেদিন আর আড্ডা জমল না। নিঃসাড়ে যে যার দিকে সরে পড়লাম।

(৪)

ছ'মাস গড়িয়ে গেছে। সেদিন আকাশটা বেশ ভারী হয়ে আছে। দীননাথ মিশ্র পালঙ্কের উপর শুয়ে দু'হাতের আঙুলগুলো দেখছে। লাল-নীল-সবজে-বেগনে নানান রঙের হরেক মাপের আংটিতে দশটা আঙুল ভরে গেছে। দু'হাতে দুটো বড় মাপের তাবিজ, শক্ত করে বাঁধা। ধুতিটা কোমর থেকে একটু আলগা করলে দেখতে পাওয়া যাবে কোমরে বাঁধা আছে গোটা তিনেক মাদুলি।

'ভুল। ভুল করেছেন নিবারণ চক্রবর্তী। গণনায় ভুলই হয়েছে ঠাকুরমশাইয়ের। হোক না বামুন, তবু তো মানুষ। মানুষ মাত্রেই ভুল হতে পারে। সেই ভুলই করেছেন এবার জ্যোতিষার্ণব। এতগুলো আংটিও কি...।'

দীননাথের চিন্তাগুলো বারে বারে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বিড় বিড় করে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করল দীননাথ।

'দাদাবাবু উনি আইছেন।'

এ ক'দিনে নিরন্তর দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে আসা দীননাথের শরীরটা মানদার ডাকে চমকে ওঠে। হ্যাঁ, আজ সকালেই তো আসার কথা ছিল, কলুটোলার সেই জ্যোতিষীর। ভাগ্নে বারীণ খোঁজটা এনেছে। গণনায় নাকি সাক্ষাৎ বরাহমিহির। দিব্য ক্ষমতা আছে বটে মানুষটার। টোটকাতেও সিদ্ধহস্ত। বারীণের হাঁপানির টান উনিই নাকি কি সব তুক্-তাক্ করে কিছুটা কমিয়ে দিয়েছেন। সেই বাকসিদ্ধ জ্যোতিষীকেই আজ অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে বারীণ ধরে এনেছে দীননাথ মিশ্রের বাড়িতে। সেই তিনিই এসে গেছেন শুনে তড়িঘড়ি করে পালঙ্ক থেকে নেমে আসতে গেল দীননাথ।

'ওনাকে ভেতরে এনে বসা। জল-মিষ্টি সাজিয়ে দে। আমি এই আসছি।'

দীননাথ পালঙ্ক থেকে হুড়মুড়িয়ে নামতে গেল। খেয়াল করেনি সেভাবে, ধুতিটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তারই কোঁচায় পা জড়িয়ে একেবারে উঁচু পালঙ্ক থেকে সোজা সান বাঁধানো মেঝেতে আছড়ে পড়ল, মুখটা নিচের দিকে করে। মাথাটা সজোরে ঠুকে গেল মেঝেতে। মুহূর্তের জন্য সমস্ত শরীরটা অবশ হয়ে গেল। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার। একবার কোনও রকমে মুখটা তুলবার চেষ্টা করল দীননাথ। পারল না। পরক্ষণেই নেতিয়ে পড়ল দেহটা। মাথার বাঁ দিক থেকে চুইয়ে পড়তে লাগল তাজা রক্ত। ঘর ভেসে গেল সেই রক্তে।

(৫)

জ্যোতিষার্ণবের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হল। দীননাথ মিশ্র এখন সম্পূর্ণ উন্মাদ। কলকাতার বড় বড় ডাক্তারও ব্যর্থ হয়েছেন। বুড়োশিবের থানে হত্যা দিয়েও ফল হয় নি।

আমাদের মনে পড়ে গেল সেই বিকেলের কথাটা। জ্যোতিষার্ণবের বৈঠকখানায় সেদিন আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলাম। নিবারণ চক্রবর্তীর ভরাট গলার অমোঘ ভবিষ্যতবাণীগুলো যেন এখনও কানে বাজছে।

'... দ্বীপ চিহ্ন। মস্তিষ্কপ্রদাহ হেতু উন্মাদ... নিবারণ চক্রবর্তীর গণনা কখনও মিথ্যা হয় না।'

(৬)

'উনিশে কুমারীত্ব নষ্ট'। 'শুভার্চন' থেকে নিবারণ চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চমকে উঠলাম। জ্যোতিষার্ণবের সামনে বসে আছে দিবাকর মুখুজ্জে। ঠাকুরমশাইয়ের মুখ থেকে এমন ভবিষ্যতবাণী শুনে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল দিবাকর।

'দিবাকর, তোমার দুর্ভাগ্য। তোমার মেয়ের অমতেই কেউ তার কুমারীত্ব হরণ করে নেবে।'

'ও... ও যে এবারই আঠারোয় পড়ল। তাহলে আর একবছর পরই...।' হতাশায় কুঁচকে আসা দিবাকরের কথা শেষ হল না। মেয়ে সবিতা ভয়ে লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে গেল। একটা প্রচন্ড আতঙ্কে বাপ-মেয়ে দু'জনেরই দমবন্ধ হয়ে গেল। জ্যোতিষার্ণব নিবারণ চক্রবর্তীর গণনা কখনও মিথ্যা হয় না। নীলুদা, দীনুদা, কার্তিক মাঝি, দোলুই পাড়ার শান্তি পিসি... সবার ক্ষেত্রেই তিনি যা বলেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। দিবাকর সব জানে। তবু চিৎকার করে বলে উঠল—'এ হতে পারে না। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

(৭)

কোলেদের রোয়াকে বসে আমরাও ঠিক করলাম, 'এ কিছুতেই হতে দেব না।' পালা করে পাহারা দিতে শুরু করলাম। আড়াল থেকে শ্যেন দৃষ্টিতে নজর রাখি সবাই। সন্দেহভাজন কোনও মানুষকে দেখলেই আমাদের নজরদারিটা আরও কড়া হয়ে ওঠে। দিবাকর মেয়েকে স্কুল ছাড়িয়ে দিল। গানের মাস্টার আসত রোববার বিকেলে। তাঁর আসা-যাওয়াও বন্ধ হল। সেলাই স্কুলে গিয়ে দু'দিনেই হাত পাকিয়েছিল সবিতা। সে সবেরও পালা চুকল। সন্ধ্যার পর তার বাইরে বেরানো নিষিদ্ধ হল। দিনেরবেলাতেও যথাসম্ভব ঘরের ভেতরেই মেয়েকে আটকে রাখার ব্যবস্থা নিল দিবাকর। নিঃসন্তান বিধবা পিসিকে কোন্নগর থেকে নিয়ে এল দিবাকর। সবিতার ছায়াসঙ্গিনী হল সেই বুড়ি। মাত্র তো দুটো বছর। ভালোয় ভালোয় দুগ্গা দুগ্গা করে কাটিয়ে দিতে পারলেই...।

(৮)

বছর ঘুরে গেল। উনিশে পা দিল সবিতা। আড়াল থেকে আমাদের নজরদারিটা আরও বেড়ে গেল।

অনেক ধুলো ঝেড়ে, পুরনো সিন্দুক থেকে হলদে হয়ে আসা ভাঁজ করা কোষ্ঠীর কাগজটা খুঁজে বের করে, জ্যোতিষার্ণবের সামনে সেটিকে মেলে ধরল দিবাকর।

'ঠাকুর, একবাঁর দ্যাখেন তো এটা। অনেক বছর আগে সবিতার মামা ভাটপাড়ার এক বড় গণৎকারের কাছ থেকে করিয়ে এনেছিল এটা। যদি কিছু...।'

'এটা দেখে আমি কি করব?' চক্রবর্তীর গলাটা একটু তীব্র শোনায়। 'তুমি কি ভেবেছ ওতে তোমার মেয়ে বেঁচে যাবে? নিয়তিকে এড়িয়ে যাবে?'

দিবাকর অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। 'আজ্ঞে, তা নয়। তবে...।'

'তবে কি, শুনি।' জ্যোতিষার্ণবের তীক্ষ্ণ চোখ দুটো সটান চেয়ে থাকে দিবাকরের দিকে।

'আ-আজ্ঞে, তা মানে, শুনেছি যে, কোষ্ঠী বিচার করে আরও ভালভাবে, মানে আ-আরও অনেক কিছু জানা যায়। তাই-ই...'

'বেশি জেনে কোনও লাভ নেই দিবাকর। আমার গণনা কখনও মিথ্যা হয় না। ওই ঠিকুজি কোষ্ঠী তুমি নিয়ে যাও।'

পাটের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন নিবারণ চক্রবর্তী। জ্বরটা কাল থেকেই বেড়েছে। বেশ দুর্বল লাগছে শরীরটা। মাথাটা ঝিমঝিম্ করছে সকাল থেকেই। কপালে হাত ঠেকিয়ে নিজেই উত্তাপটা অনুভব করার চেষ্টা করলেন জ্যোতিষার্ণব।

'তবু ঠাকুর, একবার যদি দ্যাখেন...' মিনমিনে গলায় শেষবারের মত অনুরোধ করল দিবাকর।

অসহায় পিতার করুণ অবস্থাটা কিছুটা বুঝতে পারছেন জ্যোতিষার্ণব। ওটা রেখে গেলে যদি কিছুটা সান্ত্বনা পায়, তবে পাক। হাত নেড়ে ইশারায় কোষ্ঠীটা রেখে যেতে বললেন তিনি। শরীরটা বেশ দুর্বল লাগছে। জ্বরটা আবার আসছে। চোখ বোজেন ঠাকুর।

দেখতে দেখতে বছরখানেক তো কেটেই গেল। ইতিমধ্যে কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটেনি। সেরকম কোন পরিবেশও তৈরি হয় নি। অনেকে দিবাকরকে পরামর্শ দিয়েছিল, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। প্রথম দিকে কথাটা বেশ মনে ধরলেও, শেষ পর্যন্ত সাত-পাঁচ ভেবে পিছিয়ে এসেছে দিবাকর। তাছাড়া বললেই তো আর বিয়ে দেওয়া যায় না। এছাড়া বিয়ের জোগাড় ব্যবস্থা করতে গেলে তো মেয়েকে তেমন নজরে রাখা যাবে না। সেই সুযোগে যদি... কি দরকার, আর তো ক'টা মাস।

আমরাও ভাবছিলাম, আর তো ক'টা মাস। কেন জানি না, মন বলছিল, অবশেষে বুঝি নিবারণ চক্রবর্তীর গণনায় ভুল হল। সত্যিই তো, তিনিও একজন মানুষ। তাই ভুল তাঁর একদিন না একদিন হবেই। আর সে ভুলই তিনি করেছেন এবার। সবিতার ভাগ্যই বুঝি জ্যোতিষার্ণবের জীবনের প্রথম পরাজয়।

এ এমন এক ভবিষ্যতবাণী, যা না ফললেই আমরা সবচেয়ে বেশি খুশি হব। সত্যি কথা বলতে কি, জ্যোতিষার্ণবের ভবিষ্যতবাণী ফলে যায় বলে আমরা গোপনে একটা আনন্দ অনুভব করতাম। মনে হত, হ্যাঁ এমন একটা বাকসিদ্ধ মানুষ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, আমাদের পাড়াতেই। দীনুদার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষার্ণবের কথা ফলে গিয়েছিল বলে আমরা বেশ পুলকিতই হয়েছিলাম। ঠাকুরমশাইকে নিয়ে আমাদের অহঙ্কারের জয় হয়েছিল সেদিন। তাছাড়া দীননাথ মিশ্র যে খুব একটা সুবিধের মানুষ নন, তা আমরা একটু-আধটু জানতাম। তাঁর ধন সম্পত্তি অর্জনের পেছনে অনেক অন্ধকার লুকিয়ে আছে, এ কথা পাড়ার মুরুব্বিদের মুখ থেকে শুনেছিলাম। ঠাকুরমশাই তাই বলেছিলেন, এ তার পাপের শাস্তি। সেই শাস্তি পাওয়ায় গোপনে আমরা সবাই খুশি। তাছাড়া গাড়ি চেপে আসা হোমরাচোমরা জ্যোতিষীদের ব্যর্থ হতে দেখে আমাদের বুকের ছাতি আড়ালে চওড়া হয়ে গিয়েছিল। আস্পর্ধা তো কম নয়, আমাদের ঠাকুরমশাই জ্যোতিষার্ণব নিবারণ চক্রবর্তীর সঙ্গে লড়তে আসা! এখন বোঝ ঠ্যালা। নাকে ঝামা ঘষে দিল তো।

তবে সবিতা সে রকম নয়। দিবাকর মুখুজ্জের মেয়ে সবিতা সত্যিই বড় ভাল মেয়ে। আমরা সবাই তাকে বোনের মত ভালোবাসি। মেয়েটি সব দিক দিয়েই বেশ ভাল। উপযুক্ত সময়ে কোনও ভাল পাত্রের হাতে পাত্রস্থ হলে, আমরা সকলেই খুশি হব। সুতরাং, যত দিন যেতে লাগল, আমরা ততই মনে মনে উৎফুল্ল হতে লাগলাম। এই প্রথম আমরা জ্যোতিষার্ণবের পরাজয়টা উপভোগ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

(৯)

সেদিন বৃষ্টিটাও নেমেছে আকাশ ভেঙে। অনেকদিনকার জমে থাকা আক্রোশে কালো মেঘগুলো যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। রাস্তায় জলের স্রোত বইছে। চারদিক নিকষকালো অন্ধকার। প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডবে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য দমবন্ধ করা অন্ধকার। অপরিচিতের কাছে রাস্তা-নর্দমা একাকার, অসতর্কদের পদস্খলনের সম্ভাবনা। রাত হয়ে আসছে। দিবাকর এখনও বাড়ি ফেরেনি। বাল্যবন্ধু সমরের বাড়িতে তাস পেটাতে গেছে সেই কোন দুপুরে। সমর হাজরার বাড়িটা অবশ্য একেবারে কাছেই। মিনিট পাঁচেকের রাস্তা।

দুর্যোগের রাত। তবু এখনও ফেরার কোন নামই নেই দিবাকরের। মাধবী বেশ চিন্তায় পড়ে গেল।

'মা-রে, আমার তো খুব চিন্তা হচ্ছে। এই ঝড়-জলের মধ্যে তোর বাবা আসবে কী করে। বড় ছাতাটা নিয়ে একবার এগিয়ে দেখ দিকি। সমর কাকার বাড়িতে একবার খোঁজ নিয়ে আয়।'

সবিতারও বেশ চিন্তা হচ্ছে। বাবা এখনও ফিরল না। ইদানিং চোখেও একটু কম দেখছে দিবাকর। ডাক্তারের কাছে যাবে যাবে করেও তার আর যাওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থায় এই ঝড়-জলের রাতে অন্ধকারে কী ভাবে ফিরবে বাবা, ভাবতেই মনটা সবিতার ছটফট করে উঠল।

'আমি আসছি মা। তুমি দোরটা দিয়ে দাও।'

'একেবারে সঙ্গে নিয়ে আসবি। কী যে বাপু এত তাসের নেশা, বুঝিনা।'

সবিতা এগিয়ে চলল বড় কালো ছাতাটা মাথায় দিয়ে।

'মাগো, সাপ নাকি!' একেবারে পা ঘেঁসে জলের ভেতর দিয়ে কি একটা চলে গেল ছপ্ ছপ্ করে। হাঁটুর উপর শাড়িটা তুলে সবিতা এগিয়ে চলল। আর একটুখানি। ঐ তো নারানণদা'র গুমটিটা। ঝড়-জল দেখে গুমটি বন্ধ করে নারাণদা' ঘরে চলে গেছে সামনের ঐ বাঁকের মুখেই সমর কাকার বাড়ি। ঐ তো জানলার ফাঁক দিয়ে হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে যেন। হঠাৎ মাথার পেছন দিকে একটা তীব্র আঘাত ঝাঁপিয়ে পড়ল। শক্ত কিছু একটা দিয়ে আঘাত করেছে কেউ, সবিতা বুঝতে পারল। একটা পেশীবহুল শক্ত হাত তাকে টানতে টানতে রাস্তার একধারে নিয়ে গেল। সবিতা কিছু কিছু বুঝতে পারছে, কিন্তু বাধা দেবার শক্তি তার নেই। মাথার পেছনে আঘাতটা... একটা প্রচন্ড যন্ত্রণা মাথা থেকে তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। পিছল রাস্তা, বৃষ্টির জল, নারাণদা'র গুমটি... স-অ-ব ঘোলাটে হয়ে এল। একটা শক্ত মত কিছু তাকে পিষে ফেলতে চাইল। শরীরের স্পর্শকাতর অংশগুলো কে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চাইছে। তার উনিশ বছরের শরীরটার উপর একটা ঝড় উঠেছে। সবিতা অবশ হাত দুটো দিয়ে তার ঝাপটা সামলাতে পারছে না। শরীরের দরজা-জানলাগুলো সেই ঝড়ের দাপটে সশব্দে খুলে গেল। ঝড়টা ক্রমশ তার বুকের উপর চেপে বসছে। সবিতা পারল না সেই তুফানের সঙ্গে লড়তে। অসহায়ভাবে সে আত্মসমর্পন করল সেই মহাশক্তিধর নিয়তির কাছে।

পরের দিন সকালে আমরা সবিতাকে আবিষ্কার করলাম নারাণদা'র গুমটির উল্টোদিকে। জলে-কাদায় মাখামাখি হয়ে অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। দিবাকর আর সমর ধরাধরি করে তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। ততক্ষণে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই নিষ্ঠুর সত্যটা—নিবারণ চক্রবর্তীর গণনা কখনও মিথ্যা হয় না। কাল দুর্যোগের রাতে মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে কেউ সবিতার নিষ্পাপ কুমারীত্বকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। না, সবিতার ভাগ্যও হেরে গেল। জয়ী হলেন জ্যোতিষার্ণব।

একটু বেলা হতেই আমি আর গণা গেলাম ঠাকুরমশাইয়ের কাছে, খবরটা দিতে। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে গণাকেই ঠাকুরমশাই যা একটু স্নেহ করতেন। গিয়ে দেখি, শুভার্চনের দরজা

খোলা। এই সাত সকালেই আবার কেউ ভাগ্য বিচার করাতে এল নাকি!

বৈঠকখানায় ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে গণা হাঁক পেড়ে বলল, 'ঠাকুরমশাই, এবারও আপনি জিতে গেলেন।' ভেতর থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে, আমরা জ্যোতিষার্ণবের ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়লাম। ঠাকুরঘরে ঢুকে দেখি জ্যোতিষার্ণব দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন। রোজই ভোরে তিনি দু'-তিন ঘন্টা ধ্যান করেন। এতে নাকি তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এত বেলা অবধি ধ্যান করতে কোনও দিন দেখিনি তাকে। এ সময় তো তিনি বৈঠকখানায় বসে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করেন। অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

গণা একটু গলা চড়িয়ে ডাকল—'ও ঠাকুরমশাই, বেলা যে হল। এখনও ধ্যান করছেন? সবিতাকে কাল রাতে, অন্ধকারে...' বলতে বলতে কিছু একটা দেখতে পেয়ে গণা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ঠাকুরমশাইয়ের চোখের কোণে একটা বড় মাছি বসে আছে। মুখটার কাছেও তিন-চারটে মাছি ভনভন রছে। ঠাকুরমশাইয়ের ঠোঁটদুটো কেমন ঝুলে পড়েছে।

'ও ঠাকুরমশাই,...ঠাকুরমশাই... ও ঠাকুর...' গণা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। এদিকে আমিও কুল কুল করে ঘামছি। গণা দু'হাত দিয়ে ঠাকুরমশাইকে ঝাঁকাল। আমাদের স্তম্ভিত করে পদ্মাসনে বসে থাকা ঠাকুরমশাইয়ের ঋজু শরীরটা ঠক্ করে মেঝেতে পড়ে গেল। তাঁর গৈরিক উত্তরীয়টা শরীর থেকে খসে পড়ল। আমাদের দু'জনেরই চোখ চলে গেল ঠাকুরের ডান হাতের দিকে। কবজির কাছটা টকটকে লাল রক্তে ভরে আছে। সেই রক্তে ভিজে গেছে উত্তরীয়টাও। ওখানে দু'-তিনটে মাছি উড়ে উড়ে বসছে। হঠাৎ উত্তরীয়র ভাঁজ থেকে একটা সাদা কাগজ খসে পড়ল। আমি সেটাকে কুড়িয়ে নিলাম। জ্যোতিষার্ণবের লেখা চিঠি। এই চিঠি তাঁর বাল্যবন্ধু অভিন্নহৃদয় প্রতিবেশী নির্মল মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে লেখা।

প্রিয় নির্মল,

আজ আমি নিজেকে নারায়ণের চরণে উৎসর্গ করিলাম। যদি পার, একটা সৎকারের বন্দোবস্ত করিও। আমার মৃত্যু সম্বন্ধে অধিক অনুসন্ধান করিও না। সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা লিখিয়া জানাইলাম। ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা আর শক্তি আমার ছিল। সেই শক্তিকে ব্যবহার করিয়াই আমি মানুষের ভাগ্য গণনা করিতাম এবং সেই গণনায় কখনও ভুল হইত না।

দিবাকরের কন্যা সবিতার হাত দেখিয়া, উনিশ বৎসরের মধ্যে তার কুমারীত্ব হরণ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। কিন্তু একদিন দিবাকর আসিয়া প্রায় জোর করিয়াই কন্যার কোষ্ঠীপত্র রাখিয়া গেল। ভাটপাড়ার কোনও এক বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দিয়ে তৈয়ারি করা কোষ্ঠীপত্র। আমার দেখিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দিবাকরের পীড়াপীড়িতে সেটি গ্রহণ করিতে বাধ্য হই।

আমি তখন অসুস্থ ছিলাম। সুস্থ হইবার পর কেন জানি না, আমার পাষাণ হৃদয়েও সবিতার জন্য একটু মায়া জন্মাইল। বলপূর্বক তার কুমারীত্ব হরণ হইবেই, তাহা জানিতাম। কিন্তু হতভাগিনী পরবর্তী জীবনটা কেমন ভাবে কাটাইবে, তাহা জানিবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও

কোষ্ঠীপত্রটি খুলিয়া বসিলাম। দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারিলাম যে, ঐ কোষ্ঠীটি যিনি তৈরি করিয়াছেন, তিনিও জ্যোতিষবিদ্যায় পারঙ্গম। প্রতিটি ধাপেই তিনি তাঁর নিখুঁত কর্মের ছাপ রাখিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম যে, সবিতার উনিশ বৎসরের এই দুর্ঘটনার বিষয়টি তিনি একেবারেই উল্লেখ করেন নি। উপরন্তু উক্তস্থানে সেই জ্যোতিষবিশারদের গণনা আমার গণনার ঠিক বিপরীত। উনি উনিশ বৎসর বয়সে সবিতার সুখ-সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আমি সমগ্র কোষ্ঠীপত্রটি পুনরায় আগাগোড়া খুঁটিয়ে পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু বাকি সব ক্ষেত্রে গণনা নির্ভুল হইলেও, ঐ একটি স্থানেই আমার গণনার সঙ্গে বিরোধ লাগিয়া যায়। আমি ভিতরে ভিতরে বেশ উত্তেজিত হইয়া পড়িলাম। আমার নির্ভুল গণনার উপর আমার চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস আছে। কিন্তু সময় যত এগিয়ে চলিল, আমার আত্মবিশ্বাসের প্রাসাদে যেন একটু একটু করিয়া ফাটল ধরিতে শুরু করিল। কোনও কিছুতেই আর মন বসিতে চাইত না। আমার আত্মবিশ্বাস, আমার অহঙ্কার যেন সশব্দে গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হইল। এতগুলি মানুষের সম্মুখে তাহাদের ঠাকুরমশাইয়ের প্রথম পরাজয়। ভাবিতেই ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিলাম।

গতকাল আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারি নাই। ঝড়জলের মধ্যেই ছাতা লইয়া বাহির হইলাম। দিবাকরের বাড়িতে যাইয়া সবিতার হাতটা আরেকবার দেখিব বলিয়া। কিন্তু পা যেন আর চলিতে চাহে না। নিজের উপর ক্রমশ জোর হারাইয়া ফেলিতেছিলাম। জ্যোতিঃশাস্ত্রের সব শিক্ষা কেমন যেন তালগোল পাকাইয়া যাইতেছিল মাথার মধ্যে। হঠাৎ পথমধ্যে সবিতাকে দেখিতে পাইলাম। সূচীভেদ্য অন্ধকারে সবিতা আমায় দেখিতে পায়নি। দেখিলাম, পথ প্রায় জনশূন্য। কুকুর-বিড়ালও চোখে পড়ে না। বলিলে হয়ত বিশ্বাস করিবে না, ঐ রোষায়িত প্রকৃতির উন্মুক্ত অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আমার মধ্যে এক পাশবিক বিকৃতি যেন মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল। আমার মধ্যে আমি যেন এক পিশাচকে প্রত্যক্ষ করিলাম। সেই পিশাচ কোন মতেই হারিতে চাহে না। প্রচন্ড নিষ্ঠুরতা আর শয়তানি আক্রোশের বশবর্তী হইয়া, আমি আমার হাতের যষ্টিটি তুলিয়া সবিতার মস্তকে আঘাত করিলাম। আর তারপর...।

তারপরের ঘটনা এতক্ষণে নিশ্চয়ই সব জানিতে পারিয়াছ। আমি জয়লাভ করিয়াছি, গণনায়। কিন্তু আমার সততা, আমার সংযম, আমার বিবেক বোধের নিকট আমি আজ নিষ্ঠুরভাবে পরাজিত হইয়াছি। এই পরাজয়ের জ্বালা, এই পরাজয়ের লজ্জা লইয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। কখনোই নয়। নিজেকে তাই নারায়ণের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। সম্ভব হইলে, মন চাহিলে, ঈশ্বরের নিকট আমার আত্মার শান্তির জন্য একটু প্রার্থনা করিও। এইটুকুই আমার অন্তিম অনুরোধ।

সবশেষে আবার একটা কথা বলিয়া যাই। জ্যোতিষার্ণব নিবারণ চক্রবর্তীর গণনা কখনও মিথ্যা হয় না। কোষ্ঠী প্রস্তুতে ভাটপাড়ার বিখ্যাত জ্যোতিষীই ভুল করিয়াছিলেন। আমি নই। উনিশে সবিতার কুমারীত্ব হরণের দুর্ভাগ্য লেখা ছিল এবং তা আমার দ্বারাই। নিয়তি। অলঙ্ঘ্য নিয়তি। বিধির বিধান। একে কেউই এড়িয়ে যেতে পারে না। কেউ না।

আমিও না।

তোমারই বাল্যবন্ধু
শ্রী নিবারণ চক্রবর্তী
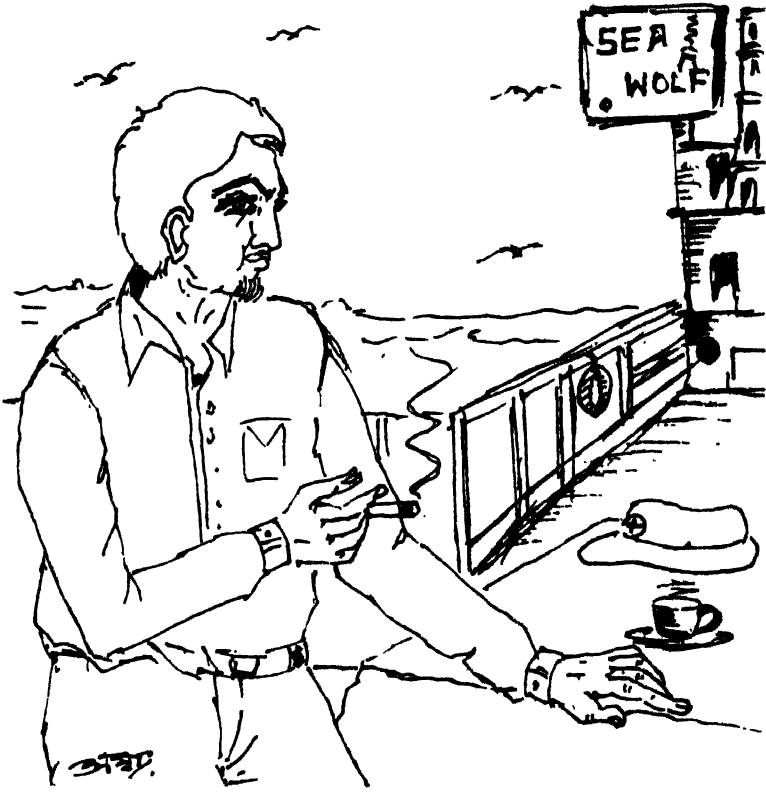
ফেয়ারওয়েল

আজ আমার 'ফেয়ারওয়েল'।

'সী উলফ্'-এর নাবিক আর অফিসাররা আজ সন্ধ্যায় বিদায় জানাবে তাদের এতদিনকার ক্যাপ্টেন সুশান্ত চৌধুরীকে। তারই প্রস্তুতি চলছে।

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে শুয়ে আছি। দুধ-সাদা টুপিটা বুকের উপর ফেলা। কাল থেকে ওটা আর মাথায় দেব না। পাতলা হয়ে আসা চুলগুলো অন্য কোনও টুপি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। কিংবা ঐ শাসমলবাবুর মত, টুপি ছাড়াই। বয়স তো হয়েছে। এখন আর লজ্জা কী।

হালকা হাওয়ায় 'সী উলফ্' একটু একটু দুলছে। ওপাশের টেবিলে সুজয়ের কলম ছুটে চলেছে। সুজয় আমার পার্সোনাল সেক্রেটারী। আজ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে সবার অনুরোধে আমাকে কিছু বলতে হবে। একটা ছোটখাট বক্তৃতা, সুজয় নিজে থেকেই তার একটা খসরা তৈরি

করছে। ওর লেখা বোধহয় শেষ হয়ে এল। আমি একটা চুরুট ধরালাম।

'এই যে স্যার, হয়ে গেছে। একবার চোখ বুলিয়ে নিন।'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলাম। পড়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না। ঐ অবস্থাতেই কোটের পকেটে রেখে দিলাম। কোনও লাভ নেই পড়ে। আমি জানি, ভাল-মন্দ যাই বলি না কেন, হাততালিতে ফেটে পড়বে গোটা কেবিনটা। এটাই স্ট্যাটাস্। এটাই ট্র্যাডিশন।

(২)

'সী উলফ্'। সমুদ্র নেকড়ে। তবে এ আমার পোষা নেকড়ে। কোনও দিন বেইমানি করে নি। ছিমছাম আলোয় সাজিয়ে রাখা ডেকটা আর আমার ঐ নিজস্ব কেবিন, বিটোফেনের হাল্কা সুর, ... সব মিলিয়ে শরীরের অবদাসটুকু ঝেড়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্টই। গলাবন্ধ কোটের দু'-তিনটে বোতাম খুলে দিয়েছি। ঠান্ডা হাওয়াটা একটু ভেতরে আসুক। বুকের ভেতরের এই গুমোট অস্থিরতা একটু প্রশমিত হোক্।

'স্যার, আপনি এখানে?'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছ।'

ছেলেটা এমন একটা ভাব করল, যেন আমাকে সে কতক্ষণ ধরেই না খুঁজছে, কত দরকারি কথা হয়ত আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি জানি, এ সব ভণিতা। আমার জবাবের মধ্যে একটা ব্যঙ্গ ভাব মিশেছিল নিশ্চয়ই। ছেলেটা বুঝতে পেরেছে। খুব একটা কথা আর বাড়াল না।

'কাল থেকেই তো স্যার, আপনাকে আর...'

জানি, কথাগুলো বেশ ভদ্রতাসূচক। আজ আমার ফেয়ারওয়েল। ছেলেটা নতুন কাজে ঢুকেছে। নামটা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এই কথাগুলো না বলা অবধি সে যেন তৃপ্তি পাচ্ছিল না। বলে বোধহয় বেশ খানিকটা হাল্কা হল। আমি জানি, এরকম আরও বেশ কয়েকজন আসবে। ঘুরে-ফিরে চলে যাবে আমার এই টেবিলের সামনে দিয়ে। থমকে দাঁড়াবে কয়েক মুহূর্তের জন্য। ঠোটের কোণে এক চিলতে হাসি আর তার সঙ্গে গলাটা বেশ ভারী করে স্বজন হারাবার বেদনা প্রকাশ করবে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে কিংবা নিজেরা সান্ত্বনা পেতে। মোট কথা, আমি চলে যাচ্ছি। এতে ওদের বুক ফেটে যাচ্ছে, দুঃখে। সেটা বোঝানো চাই। না হলে আমার রেহাই নেই।

আবার ওরা যদি এরকম না করত, তাতেও একটা অস্বস্তি কাজ করত আমার মনের মধ্যে। মনে হত, এতদিন একসঙ্গে ঘর সংসার করলাম, তবু এরা বুঝি কেউ-ই আমাকে ভালোবাসেনি। কিন্তু এই যে মাঝেমাঝেই টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে অফিসারেরা সৌজন্য দেখিয়ে যাচ্ছে, কতকগুলো মেকি ভদ্রতাসূচক শব্দ উচ্চারণ করছে, এতেও কি আমি খুব একটা তৃপ্তি পাচ্ছি? না, তাও নয়। এও এক এক সময় অসহ্য ঠেকে। রগের শিরাটা দপ্ দপ্ করে। টেবিল চাপড়ে বলতে ইচ্ছা করে, 'স্টপ ইট স্কাউন্ড্রেল'। জানি, ওরা মুখোমুখি কোনও প্রতিবাদ করবে না। আড়ালে ঠোট উল্টে বলবে, 'শালা, বুড়ো হাড়েও ঝাল যায় নি'।

(৩)
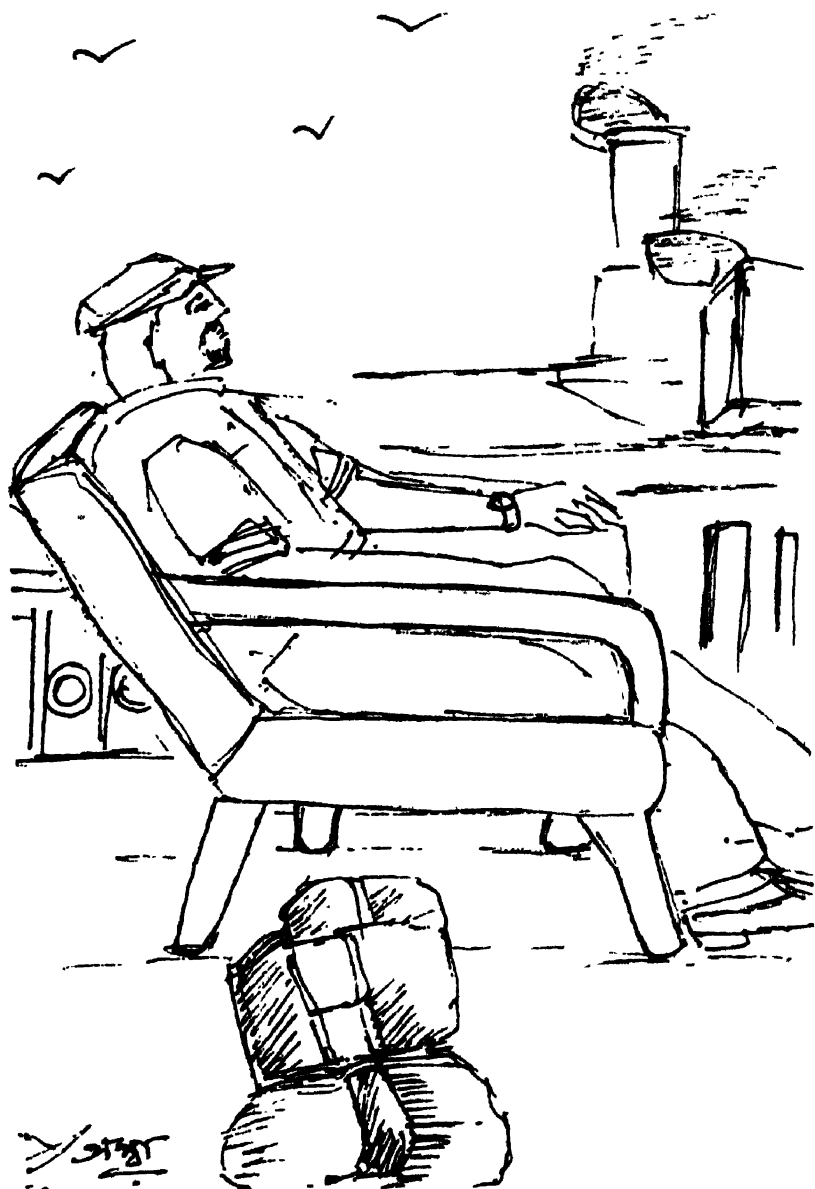
ঐ যে মল্লিক আসছে। নামটা বেশ সুন্দর। পল্লব বসু মল্লিক। মুখটা এখন থেকেই বেশ দুঃখী দুঃখী করে রেখেছে। এ জাহাজে মল্লিক প্রায় বছর দশেক কাজ করছে। এ ক'বছরে যারাই অবসর নিয়েছে, তাদের সবার জন্যই...। আজ সন্ধ্যায় মল্লিক কি করবে, আমি জানি। মাউথ পিস্‌টা হাতে নিয়ে, ব্যথিত চোখে দু'-একবার এদিক-ওদিক তাকাবে। তারপর গলার স্বরটা যতটা সম্ভব ভিজিয়ে নিয়ে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বলবে—

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আজ ... আজ আমাদের কর্ম জীবনের সবচেয়ে শোকাবহ দিন। আমার প্রিয়, আমাদের সবার প্রিয়, কাছের মানুষ মহান ক্যাপ্টেন শ্রী সুশান্ত চৌধুরীকে আজ আমরা বিদায় জানাচ্ছি। আমাদের ক্যাপ্টেন ছিলেন একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ... আমরা সবাই আজ অভিভাবকহীন হয়ে পড়লাম...।'

বলতে বলতে চোখের কোণে জল এসে যাবে। মাউথ পিসটা ছেড়ে এগিয়ে এসে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরবে। একেবারে যন্ত্রচালিত মেশিনের মত। প্রতিটি ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানেই মল্লিকের এই একটাই কাজ। যেন ওর পালনীয় কর্তব্যগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। ঠান্ডা গলায় আমাকেও সান্ত্বনা দিতে হবে। এজন্য মল্লিককে আড়ালে অনেকেই 'ওয়াটার সাপ্লাই অব ইন্ডিয়া' বলে।

একেক সময় মাথা গরম হয়ে যায়। এখুনি ইচ্ছা করছে, উঠে গিয়ে মল্লিকের কলার দুটো চেপে ধরে বলি, 'ডোন্ট মেক সাচ্ ড্রামা টু ডে নাইট'। অন্তত আমাকে তুমি মুক্তি দাও। তোমার ঐ নাটুকেপনার হাত থেকে। আবার মাথাটা ঠান্ডা করার চেষ্টা করি। গরম হয়ে ওঠা চিন্তা ভাবনাগুলোকে ভিজে হাওয়ার বুকে ছেড়ে দিই। নিজেকে সংযত রাখি। আজ আমার শেষ দিন। আজ আমার ফেয়ারওয়েল।

(৪)

'হাই ডারলিং! সুইট্ ইভিনিং...।'

নকল হীরের আংটি পড়া একটা নরম হাত আমার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল। চিন্তায় ডুবে ছিলাম। চমকে উঠলাম। মুখ তুলে দেখি, পলি। মিস্ পলি, 'সী উলফ্'-এর একমাত্র মক্ষীরানী। ব্যাস্, আমি মনে করি ওইটুকুই ওর পরিচয়।

আমি বরাবরই এ ব্যাপারে বিরোধিতা করে এসেছি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে আমার মত ধোপে টেকেনি। ক্যাপ্টেন হয়েছি বলে সব ব্যাপারেই কাপ্তেনি করা আমার স্বভাব নয়। ঘরে বিয়ে করা বউকে ছেড়ে, মাসের পব মাস, বছরের পর বছর যাযাবরের মত জলে ভেসে থাকা ক্ষুধার্ত যৌবনগুলোর তৃপ্তি মেটাতেই মিস্ পলির উপস্থিতি। সেটা বুঝি। শুনেছি, পলিদের অবস্থাও ভাল নয়। এই করেই সে যা পায়, তারই বেশ কিছুটা বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। আসলে পলি হল আমাদের জাহাজের ছোট্ট হাসপাতালের একমাত্র নার্স। একজন ডাক্তার আর একজন নার্স—এ নিয়েই আমাদের ছোট্ট চলমান জাহাজ-হাসপাতাল। তবে পলির তন্বী বাহুর আকর্ষণে ধরা পড়েনি, এমন ক্ষমতাবান এ জাহাজে খুব বেশি নেই।

সেদিনটার কথা মনে পড়ছে। কাজ সেরে অন্ধকার কেবিনে ফিরে এসেছি। সমুদ্র নেকড়ে নোঙর ফেলেছে তাসি দ্বীপে। কেবিনে ঢুকে হাত বাড়িয়ে সুইচবোর্ডটা খুঁজছি। তার আগেই হাতটা কে যেন ধরে নিল। দুটো কোমল বাহু আমার ক্লান্ত শরীরটাকে শঙ্খচূড় সাপের মত জড়িয়ে ধরল। পুরু করে লিপস্টিক লাগানো এক জোড়া ঠোঁট আমার গালের উপর চেপে বসল।

'কাম অন ডারলিং, এনজয় মি।'

পলির গলার স্বর নেশা ধরিয়ে দেয়। নাভির নিচে উষ্ণকুণ্ডে শরীর মনের সবকিছুকে ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে। নিজেকে ঠিক রাখা মুশকিল। বুঝলাম, আজ পলি এসেছে মোটা দাঁও মারতে। ক্যাপ্টেনকে এক রাতের জন্য শরীর দিয়ে বেশ মোটা টাকা কামিয়ে নেবে। ভাবতেই ভেতর থেকে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। এক ঝটকায় পলির অর্ধনগ্ন শরীরটা কার্পেটের উপর ঠেলে ফেলে দিলাম। ড্রয়ার খুলে পাঁচশ' টাকার তোড়াটা মুখের উপব ছুঁড়ে দিলাম। সে দিনের পর ক্যাপ্টেন সুশান্ত চৌধুরীর ঘরে মিস পলিকে আর কেউ কোনও দিন দেখেনি।

পলির সঙ্গে করমর্দনের কোনও ইচ্ছা ছিল না। তবু আজ শেষ দিন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে দিলাম। পলি সেটা বুঝতে পেরে হাত মিলিয়েই চলে গেল। ক'বছর আগে হলেও, সে গালে একটা চুম্বু এঁকে দিত। কিংবা হিস্ হিস্ করে বলে যেত কোনও ভালবাসার কথা। শরীরের সব রক্ত এসে জমা হত মুখে। ঠোঁটটা উত্তেজনায় শক্ত হয়ে যেত। মনে হত অনেকদিন কিছু খাইনি। যাক্ সে কথা। এই বুড়ো ডারলিংয়ের তোবড়ানো গাল এখন আর পলিকে টানে না। তাছাড়া ফুরিয়ে যাওয়া ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে আর তেমন বেশি সওদা হয় না। পলি হিসেবি মেয়ে। বাড়তি কিছু সে...।

(৫)

'আর কিছু নেবেন, স্যার?'

আজ কেমন যেন মাঝে মাঝেই নিজের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। এলোমেলো চিন্তার জালে বারে বারেই জড়িয়ে পড়ছি। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। মুখটা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ডিসুজা। টেবিলে এক কাপ গরম কফি। এখনও ধোঁয়া উঠছে। কয়েক মিনিট চোখে চোখ রেখে বসে রইলাম। ডিসুজার লম্বা মুখটায় একটা কোমল বিষাদের ছায়া। চোখ দু'টো এ বয়েসেই অনেকটা ভেতরে বসে গেছে। রোগা শরীরটা সাদা ফতুয়ায় ঢাকা। মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা।

আমি রোজই এ সময়টা গরম কফি খাই। শুধু কফি, দুধ ছাড়া। আর কিছু নয়। এ আমার সতেরো বছরের ক্যাপ্টেন জীবনের এক অদ্ভুত নেশা। ডিসুজাই রোজ কফি নিয়ে আসে। কাপটা টেবিলে রেখে এই কথাটাই প্রতিদিন বলে ওঠে— 'আর কিছু নেবেন, স্যার?'

এক এক দিন রেগে যেতাম। 'জানিসই তো এ সময় আর কিছু খাই না। কেন রোজ রোজ বিরক্ত করিস?'

ডিসুজা আমতা আমতা করে বলত, 'তবু-তবু স্যার, যদি কিছু নেন। ভাল সুজি করেছি।
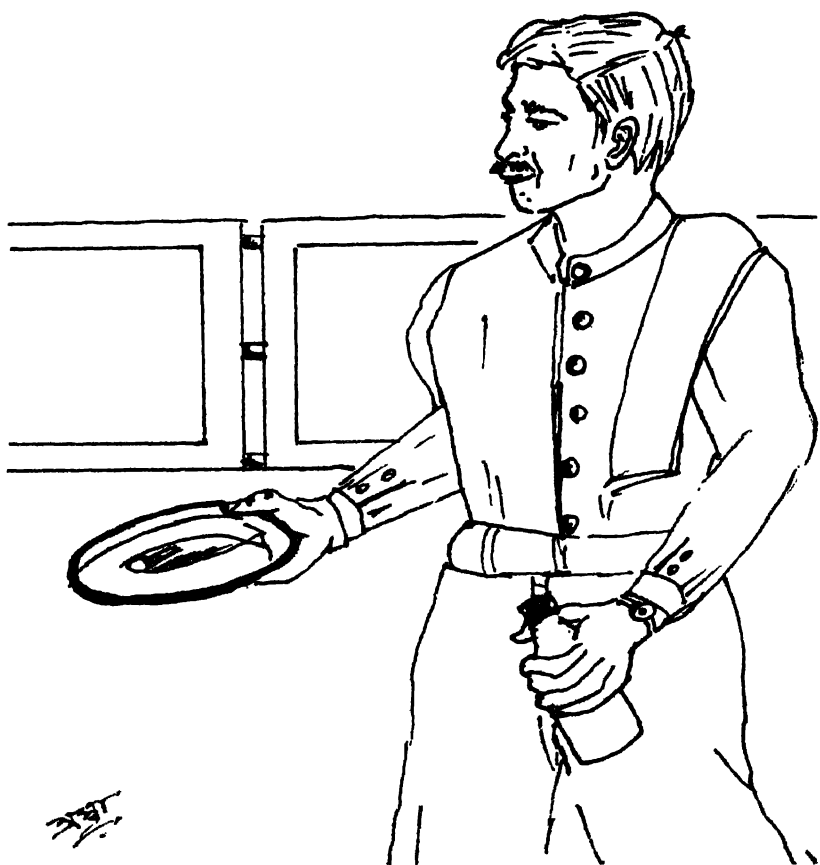
একটু খেয়ে দেখবেন নাকি?'

জাহাজী মেনুতে সুজি একেবারে অচল, অপাংক্তেয়। তবু সুজি আমার প্রিয় খাদ্য তালিকার অন্যতম আইটেম। সেই কতকাল আগে মায়ের হাতে নোনতা সুজি খেয়েছি, সে স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে। কথাচ্ছলে সেই অনুভূতি প্রকাশ করে ফেলেছিলাম কোনও অসতর্ক মুহূর্তে। ডিসুজা মনে রেখে দিয়েছিল সে কথা। বড় দিনের ছুটিতে ঘরে ফিরে 'গ্রান্ড মা'র কাছ থেকে শিখে এসেছিল রেসিপি।

কেন জানি না, ডিসুজার কথার মধ্যে একটা গভীর আন্তরিকতার সুর বাজত সব সময়। সেই সুর শুনে আমার ঘোর কেটে যেত। কুয়াশা ভেঙে রোদ ওঠার মত। বড় আপন করে, ভালবেসে সে কথাগুলো বলত। কোনও কোনও দিন ফেরাতে পারতাম না। বলতাম, 'যা নিয়ে আয়, দেখি।' শুনে খুশিতে ওর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। যেন আমি খেলে, তবেই তার রান্নার সার্থকতা। আজও সে একই প্রশ্ন করেছে আমায়। গভীর আন্তরিকতায় ভরা কথাগুলো আজ যেন একটু অকৃত্রিম বেদনার ছোঁয়ায় ক্লান্ত। তবু একটাও বাড়তি কথা সে বলে নি। আমিও কোনও জবাব দিতে পারলাম না। ডিসুজা নীরবে রসুইঘরের দিকে চলে গেল। আমি মাথা নিচু করে, মুখটা দু'হাতের চেটোয় ঢেকে, কনুইটা টেবিলের একেবারে প্রান্তভাগে ঠেকিয়ে জড়বৎ বসে রইলাম।

আজ সন্ধ্যায় আলো ঝলমল পরিবেশে এক ঝকঝকে ফেয়ারওয়েলের অনুষ্ঠান আমার পথ চেয়ে বসে আছে। সেই অনুষ্ঠানে উপহারে আর স্তুতিবাক্যে সমৃদ্ধ হব আমি। সবাই মিলে সাড়ম্বরে বাজিয়ে দেবে আমার ছুটির ঘন্টা। সেই ঘন্টাধ্বনি আমি যেন এখনই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই ঘন্টাধ্বনিকে ছাপিয়ে কার যেন এগিয়ে আসার অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঘাড় তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, রবার্তো ডিসুজা আবার ফিরে আসছে। পড়ন্ত রোদের আলোয় ডিসুজার ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেছে। ডিসুজার হাতে একটা চিনামাটির তৈরি দুধ সাদা প্লেট। সেই প্লেটের উপর রসুই ঘর থেকে নুনে জারানো দু'খানা গরম গরম স্যামন মাছ ভাজা।

নাবিকদের বড় প্রিয় এই স্যামন মাছ।

আমার সর্বোত্তম ফেয়ারওয়েল।
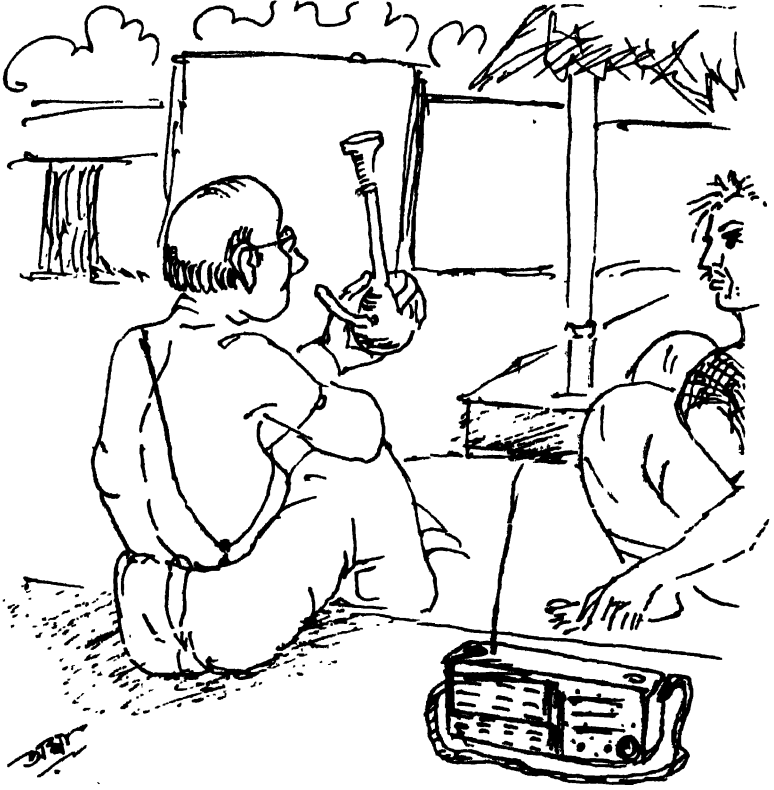
পরিবর্তন

সকাল থেকেই শরীরটা কেমন ঝিম ধরে আছে। বেশ কয়েকবার উঠব উঠব করেও গড়িয়ে নিচ্ছে মেঝেতে। সুষমা উনুনে আঁচ ধরিয়েছে।

'অ্যাই মিনু, তোর বাবাকে ডাক না। বেলা যে গড়িয়ে গেল। মাঠে যাবে না, নাকি?'

ষোল বছরের মিনুর শরীরটা দাগধরা ছেঁড়া ফ্রকে কোনও মতে আটকে আছে। সেরকম ধান্দাবাজ লোকের ক্ষুধার্ত দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। মিনু উঠে গিয়ে বাবাকে ডাকল।

'মিলের ভোঁ বাজি গেছে?'

মিনু ঘাড় নাড়ে। 'সে তো কতক্ষণ হল, উঠবে না?'

কুঁড়েমি ঝেড়ে উঠতে চাইছে না শরীরটা। 'মাইয়্যাগুলোকে নিয়ে আর পারা গেল না।' পাশ ফিরে হাতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল রসিক। খানিকক্ষণ আধশোয়া হয়ে থম

মেরে বসে রইল। খোলা দরজা দিয়ে উঠোনটা দেখা যাচ্ছে। ঘরের চাল থেকে খড় ছিঁড়ে সুষমা আঁটি বাঁধছে। দেখামাত্র মাথায় আগুন ধরে গেল।

'হেই পোড়ামুখী, চালা ভেঙে ফেলবি নাকি?'

'কি করব, খড় কোথায়? ধবলী খাবে নি?' সুষমা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'শালা, নিজে খেতে পাচ্ছে না, তার আবার গরু পোষা। বালতি ভরে দুধ দিলে তাও না হয় বুঝতুম। এ তো...।'

বিড় বিড় করে গাল পাড়ল রসিক। সকাল বেলাতেই মুখ খারাপ হয়ে গেল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে তড়িঘড়ি সে বেরিয়ে পড়ল মাঠে। ধবলীটা এখনও মাথা নাড়ছে। গলায় বাঁধা ঘন্টিটা থেকে টুংটাং শব্দ হচ্ছে। ছ' বছরের ধবলীটাও এখন দু'চক্ষের জ্বালা। উঠোন পার হতে হতে আরেকবার গালি দেয় রসিক।

'শালা জানোয়ার'।

(২)

লম্বা মিছিলটা এ দিকেই এগিয়ে আসছে। গোপী আর কেষ্টা একটা বড় পতাকা উঁচু করে ধরে আছে। পতপত করে উড়ছে সেটা। ঐ পতাকাটার প্রতি একটা অদম্য আকর্ষণ অনুভব করে রসিক। ছুটে গিয়ে ওদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে রাখতে ইচ্ছা করে তার। ভেতরকার জ্বালা যন্ত্রণাগুলো এ ভাবেই ঢেকে রাখতে চায় রসিক। তবে মিটিং মিছিলের ব্যাপারটা রসিকের মনে ধরে না। এসবের কি প্রয়োজন, তা সে আজও বুঝে উঠতে পারে নি। তার শুধু ভালো লাগে ঐ পতাকাটা। রাতে শুয়ে শুয়ে সে অনেকদিন স্বপ্নে ঐ পতাকাটা দেখেছে। দেখেছে যে, শীতের সকালে সে ঐ পতাকাটা গায়ে জড়িয়ে ধান মাড়াই করতে গেছে।

দেখতে দেখতে মিছিলটা একেবারে কাছে চলে এল। ওদের মাঝখানে রাখালবাবু। কেষ্টা গলা উঁচিয়ে রসিককে ডাকল।

'ও রসিকদা, চল আমাদের সঙ্গে।'

রসিক কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। কিন্তু মনে মনে বলে, 'তোমাদের সঙ্গে গিয়ে ঘোড়ার ডিমের হবেটা কী। ঐ তো রোদ্দুরে ঠায় দাঁড়িয়ে অমুক বাবুর তমুক বাবুর বুলি শুনতে হবে। সব শহর থেকে এসে বুলি ঝেড়েই চলে যান। কাজের কাজ তো কিছুই হয় না। তার চেয়ে তোমার হাতের ঐ পতাকাটা দাও দিকি। ডান্ডা থেকে খুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে একটু জ্বালা জুড়াই।'

তবে মনসাতলার রাখালদা' মানুষ ভাল। রসিক সেটা জানে। তবু এদের এসব হৈ-চৈ তর্জন-গর্জন রসিকের ভাল লাগে না। শুনেছে, কলকাতাতেও নাকি এর চেয়ে অনেক বড় বড় মিছিল বের হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই মিছিলে পা মেলায়। কিন্তু এরা ঠিক কি চায়, কি-ই বা করবে, সেটা রসিকের মাথায় ঢোকে না। প্রহ্লাদ একদিন বোঝাতে এসেছিল। কিন্তু রসিক বুঝতে পারে নি।

বুঝবেই বা সে কী করে। যে প্রদীপে তেল নেই, সে তো আলো দেয় না। রাখালবাবু একবার

সতুদের জমিতে 'ইস্কুল' মত কী একটা বেশ খুলেছিল। সেই দিনটার কথা রসিকের আজও মনে আছে। খবরটা যে প্রহ্লাদের মুখ থেকেই শুনেছিল। শুনে রসিকের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়। ঘরে ফিরেই সুষমাকে হাঁক দিল সে।

'বলি ও মিনুর মা, খবরটা শুনেছিস্? পেল্লাদ কি বলে গেল্।'

'বলি চিল্লে তো মাথা ফাটিয়ে দিলে। কি এমন হাতি-ঘোড়া হয়েছে গা?'

'ইস্কুল হবে গো, ইস্কুল।.রাত্তিরবেলার ইস্কুল।'

'তো আমি কি করব? সেখানে লাচব না গাইব?'

'দূর পোড়ামুখী! তুই ব্যাটা আকাট মুখ্যু। এসবের তুই কি বুঝবি? লেখা-পড়া হবে। বুঝলি, লেখা-পড়া শিখবে সবাই।'

'অ। তা তুমিও শিখবে নাকি!'

'শিখবই তো। লিচ্চয়ই শিখব।'

'মরণ!'

সেই দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে রসিক কেমন ঝিমিয়ে পড়ল। দুত্তোরি, কোথায় কী, ইস্কুল-টিস্কুল সব উঠে গেল দু'দিনেই। ঐ বড় বাবুটাই কি সব হাঙ্গামা-ফ্যাসাদ্ বাঁধিয়ে, ভয় দেখিয়ে 'ইস্কুল' বন্ধ করে দিলেন। তখন রাখাল মুখুজ্জের অত জোর ছিল না। বড়বাবু একদিন রসিকদের ডেকে বললেন, 'বুড়ো বয়সে পন্ডিতি করবি নাকি! অ্যাঁ? লাঙ্গল ধর, চাষ কর। টাকা পাবি।'

এখন রাখালবাবুর অনেক জোর। রসিক ভাবে, সে এখন রাখালবাবুকে বলবে, 'আরেকবার ঐ ইস্কুলটা খোলা হোক। এবার আর কেউ বন্ধ করতে পারবে নি।'

কিন্তু সে কথা আর বলা হয়ে ওঠে না।

(৩)

'আজকেও সাতজন কামাই মারল। বাবুরা সব মিছিলে গেছে। বলি, ন'বিঘেটা নিড়েন হবে কি করে, শুনি।'

বড়বাবু ক্ষোভে আক্রোশে ফেটে পড়লেন। রসিক এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়েছে।

'এ্যই যে বাপ্, তুমি এসে গেছ, দেখছি। আমি ভাবলাম, তুমিও বুঝি দলে ভিড়েছ।'

রসিক খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে তো কোনও দিনই ও সব মিছিলে যায় নি। তবু কেন ...। চারদিকে চেয়ে দেখল। সত্যিই সে বাদে আর মাত্র দু'জন এসেছে। বাকিরা বোধহয় ঐ মিছিলেই গেছে। বড়বাবুর ধারাল মুখটা দেখে রসিকের বুকটা কেঁপে উঠল। নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিল। ভয় নেই, কিছু ভয় নেই। সবাই গেলেও, সে তো যায় নি। রাখালবাবুর ঐ মিছিলে না গিয়ে ভালই হয়েছে। বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন। রসিক কী আর না এসে পারে। বছরের ক'টা দিনই বা কাজ জোটে। নিজের তো আর জমি বলতে কিছু নেই। বড় বাবুর জমিতেই লাঙ্গল ঠেলে যা দু'-এক পয়সা হয়। তবে বড়কর্তা আশাও দিয়ে রেখেছেন।

এই তো সেদিনই রঘু জিজ্ঞাসা করছিল, 'আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা হবে তো?'

বড়বাবু দেঁতো হাসি হেসে বলছিলেন, 'হ্যাঁ, ওই জমিটা তো তোরাই বরাবর দেখে আসছিস। ওটা বলতে গেলে তোদেরই হয়ে গেছে, কী বল।'

বড় কর্তার হাসি হাসি মুখটা দেখে ওরা সবাই একটু আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করে। এটা তাদের অনেক দিনেরই দাবী। একটু নিজস্ব জমি, যাতে সম্পূর্ণ নিজের মত করে চাষ করা যাবে। তার থেকে অবশ্য বড়বাবুর প্রাপ্যটা তারা মিটিয়ে দেবে।

'বুঝলি, ওসব মিটিং মিছিল করে কিৎসু হবে না। এক কাটা জমিও আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, তোদের একটা ব্যবস্থা আমি করে দেবখন।' বড়বাবু হাসেন।

রসিক মনে মনে ছবি আঁকে। এক ছটাক্ জমি, তার নিজের। একাই বেশ করে চষে ফেলবে। হেমন্তের রোদ্দুরে ঝিকমিক করে উঠবে ঐ হলদে শীষগুলো। যেন কথা বলে উঠবে রসিকের সঙ্গে। ভালবাসার কথা, ভাললাগার কথা। পরম সোহাগে সেগুলোর বুকে হাত বুলিয়ে রসিক শুধু হাসবে। সুখের হাসি, পরিতৃপ্তির হাসি। শুনেছে ভাল ফলন হলে, সরকার থেকে 'পেরাইজ' পাওয়া যায়। ঐ তো রামদয়াল একটা ছোট রেডিও পেয়েছে। গত পরশু ওই রেডিওতেই তো রসিক হিন্দি গান শুনে এল। সারাদিনই তাতে ভাল ভাল গান বাজে। এফ-এম না এম-এম, কি যেন বলল রামদয়াল। নতুন বেরিয়েছে বাজারে। ঠিকঠাক সবকিছু ঐ রামদয়ালই জানে। তবে রসিকও একদিন জানবে। সব জানবে। ভাল ফলনের জন্য সরকার নাকি চাষী ভাইদের ভাল সারও দেয়। সত্যিই কত সুবিধে, কত আনন্দ, কত মজা। শুধু এক ছটাক জমি চাই নিজস্ব। জমিটুকু একবার হাতে পেলেই... এর চেয়ে বেশি কিছু আর ভাবতে পারে না রসিক।

(৪)

সন্ধ্যায় ভজু এসে কড়া নাড়ল। বড়বাবু রসিককে ডেকে পাঠিয়েছেন। এমন অসময়ে তলবের কারণটা কী হতে পারে, রসিক বুঝতে পারল না। তাড়াতাড়ি ধুতিতে মালকোঁচা মেরে বেরিয়ে পড়ল সে।

বড়বাবু খোলা বারান্দায় তাকিয়ায় ভর দিয়ে মাদুর পেতে শুয়েছিলেন। মাথার কাছে একজন হাওয়া করছে। রসিক এসে দাঁড়াল দরজার সামনে।

'আয়। এদিকে আয়'। বড়বাবু একটু নড়েচড়ে উঠে বসলেন। 'তোর সঙ্গেই কথা আছে।'

রসিকের পা দু'টো একটু কেঁপে উঠল। এভাবে একা ডেকে এনে বড়বাবু কাউকে কোনওদিন কোনও কথা বলেছেন কিনা, তা অনেক চেষ্টাতেও রসিক মনে করতে পারল না। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এল সে।

'এবার তোর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' রসিকের বোকা বোকা মুখটার দিকে চেয়ে একটু করুণার হাসি হাসলেন। 'তোর বাড়ির সবাই ভাল তো?'

রসিক অবাক হল। ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নাড়ল।

'তুই সেদিন কি যেন বলছিলি?'

রসিক আবার অবাক হয়ে গেল। কই, সে তো কোনওদিন কিছু বলেনি।

'জমির কথা বলছিলি তো। ঠিক আছে, নারাণদের পাশেরটুকু ভাবছি তোকেই দিয়ে দেব। ওদিকটাতো তুই-ই দেখিস, তাই না?'

রসিকের ঘাড়টা আবার একপাশে হেলে পড়ল।

'আচ্ছা, যা এখন। ও হ্যাঁ, তোর মেয়েটা এখন কি করে রে? সেদিন গাজনের মেলায় দেখলাম মনে হল। পাঠশালায় দিয়েছিস্ নাকি?'

রসিক এবার ঘাড় নাড়ল, দু'পাশে। 'আজ্ঞে না কর্তা, পয়সা নেই। তাছাড়া পাঠশালায় পড়ার বয়স আর তার নেই। রাত্তিরের ইস্কুলটা খুললে একবার পাঠিয়ে দেব ভেবেছি! তবে সে ইস্কুল তো...।'

'সে ঠিক আছে। কিছু চিন্তা করিস না। পয়সা-টয়সা এবার তোর অনেক হবে।'

পয়সার কথায় রসিকের মুখটা চক্চক্ করে উঠল। বড়বাবু আবার তাকিয়ায় হেলান দিলেন। ভজুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ওরে ভজু, রসিককে একটু এগিয়ে দিয়ে আয় তো।'

রসিক বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে ভজু। সদর দরজার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বড়বাবুকে আবার একটা 'পেন্নাম' করল। তারপর বিহ্বল দৃষ্টিতে ঢালু জমিটা দিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তায় নেমে এল।

রসিকের আপ্লুত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ভজু আদুরে গলায় বলে উঠল, 'তোর কপাল এবার ফিরল রে।'

রসিক এখনও কিছু বুঝতে পারছে না। এরকম অযাচিত প্রাপ্তির জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। যদিও এটা তার অনেক দিনের স্বপ্ন। তবু এভাবে এত সহজেই... নাঃ, বিশ্বাসই হতে চাইছে না। বোকার মত মুখ করে সে চেয়ে থাকল ভজুর দিকে।

'বাবুকে কিছু ভেট দিবি তো?'

রসিক এবার ঘাবড়ে গেল। 'ভেট? আ-আ-আমি?'

'সে কিরে! দিবি না?'

'আ-আমার ঘরে কী-ই বা আছে, দেবার মত?'

'নেই? কেন, তোর মেয়েটা।'

'মিনু?'

'বাবুর কাছে দিয়ে দে। অনেক সুখে থাকবে।'

এ কি শুনছে, রসিক! ভজু কি বলছে! মিনুকে ...! কথাগুলো গরম লোহার শিকের মত তার কানের ভেতরে গিয়ে বিঁধছে। চোখে অন্ধকার দেখছে রসিক। একটু একটু করে গড়ে তোলা স্বপ্নের ইমারতটা তাসের ঘরের মত ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়ছে। বড়বাবুর ধারাল মুখ, ধূর্ত হাসি, ভজুর দিকে আড়চোখে তাকান, আর প্রচ্ছন্ন অশালীন ইঙ্গিতগুলো এবারে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, রসিকের চোখের সামনে। জমি বাবু দেবে না, রসিক বুঝতে পারছে। মিনুকে দিলেও জমি সে পাবে না। শয়তান বাবু মাংস চায়, তাজা কাঁচা মাংস। ওফঃ! আর কিছু রসিক ভাবতে পারছে না। ভজুকে এক ধাক্কায় ঠেলে দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে রসিক কোনও রকমে ঘরে এসে ঢুকল।

(৫)
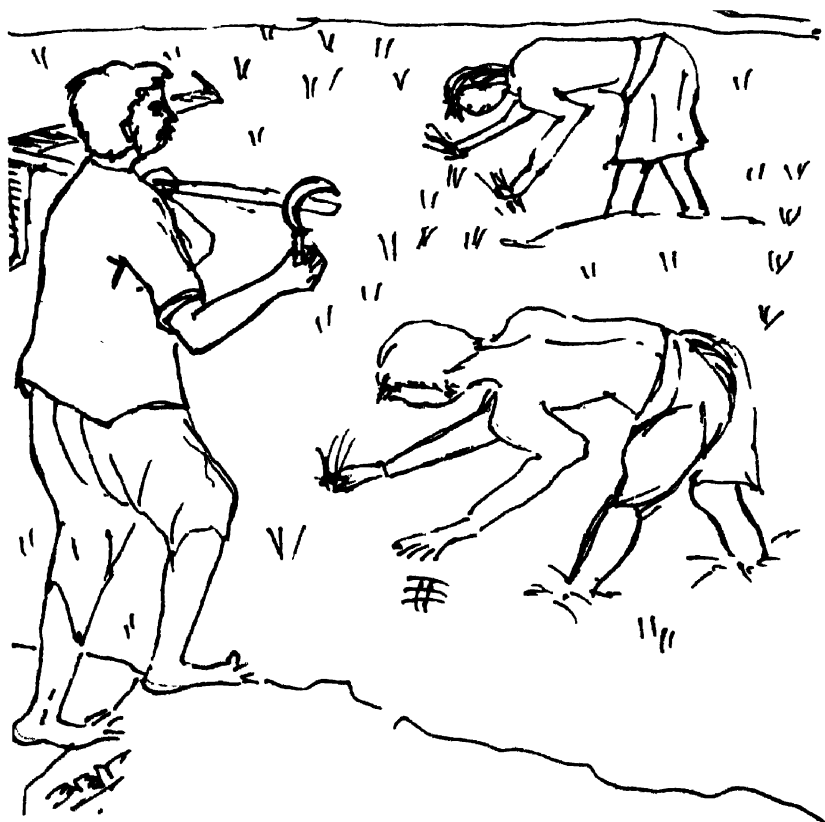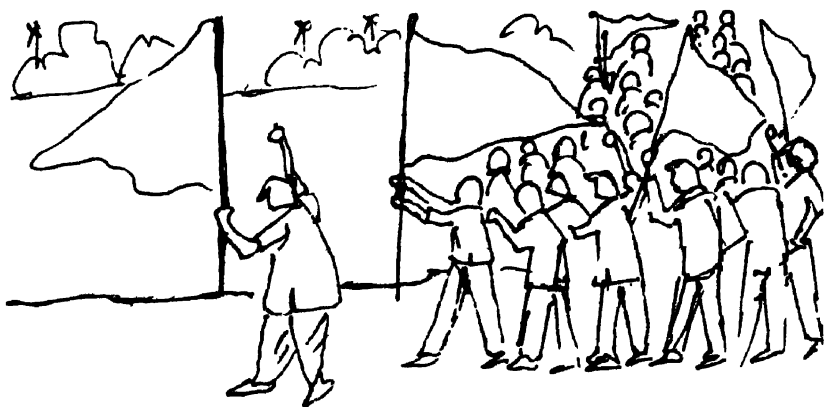
একটা প্রচন্ড আতঙ্কবোধ আর তার সঙ্গে দুঃসহ ঘৃণায় রসিক কাল সারারাত ঘুমাতে পারে নি। ঠান্ডা রক্তের স্রোত শিড়দাঁড়া বেয়ে নেমে গেছে বারকতক। সুষমার পাশে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকা মিনুর নিষ্পাপ মুখটার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে হাঁফিয়ে উঠল। মনে হল, দমটা বুঝি একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। বুকের ওপর থেকে পাথরটাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল অনেকবার। হাতপাখাটা জোরে জোরে নেড়ে হাওয়া খেল অনেকক্ষণ। শেষে ছুঁড়ে ফেলে দিল তালপাতার নতুন হাতপাখাটা।

রসিকের মাথায় খুন চেপে গেল। ধারাল কাস্তেটা একবার শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেও মাটিতে নামিয়ে রাখল। শালা, গাজনের মেলায় মিনুর উপর নজর দিয়েছে। টের পেলে, তখনই টাঙির এক কোপে হারামজাদার...। মাথাটা দু'পাশে জোরে জোরে ঝাঁকাল রসিক। না, সে একা পারবে না। বড়কর্তাকে নিকেশ করে দিলেও, তার চ্যালা-চামুন্ডা আছে। তারা তুলে নিয়ে যাবে মিনুকে। বাঁচতে দেবে না সুষমাকে। রসিকের মরণে ভয় নেই। কিন্তু সুষমাকে যদি... মিনুর উপর যদি ওরা...।

রসিকের মুখটা টান টান হয়ে ওঠে। মনে পড়েছে রসিকের। একজন পারে। হ্যাঁ, একমাত্র রাখাল মুখুজ্জেই পারে রসিকদের বাঁচাতে। এ তল্লাটে রাখালদা'ই পারে বড়বাবুর মুখের উপর কথা ছুঁড়ে দিতে। সে সাহস তার আছে। নির্ভীক, ন্যায়নিষ্ঠ আর সংগ্রামী মানুষ বলে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ যে তার মত আর কেউ করতে পারে না, এ কথা সবাই জানে। বড় কর্তার সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিতে পারবে মনসাতলার রাখাল মুখার্জী।

এদ্দিন রাখালদার কথা রসিক বুঝতে পারত না। হয়ত বুঝতে চাইত না। কিন্তু আজ সে অনুভব করছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার ভাষা চাই। আর এই ভাষা হল সমবেত উচ্চারণের ফসল। রাখাল মুখুজ্জে এই ভাষার কারিগর। তার দীপ্ত চোখের দৃষ্টি রসিককে সাহস জোগায়, স্বপ্ন দেখায়।

(৬)

মিছিলটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। রসিকের ভাললাগা, কোনও এক কল্পিত শীতের সকালে গায়ে জড়ানো পতাকাটা পতপত করে উড়ছে। রসিক ধান রুইতে রুইতে আজও পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছে। তাকে আর কেউ ডাকে না। সবাই জানে, সে আসবে না। রসিককে পেছনে ফেলে মেঠো পথ ধরে মিছিল এগিয়ে যায় বাগদি পাড়ার দিকে। মিছিল খানিকটা এগোতেই একটা নতুন মুখ এসে যোগ দিল মিছিলে।

সে রসিক।

নেকলেস

সোরগোলটা কানে এল অনিমেষের। দোতলার ওই কোণের ঘরটা থেকে, দীপাকে যেখানে সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছে, সেখান থেকেই গোলমালটা শুরু। কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর পুরো বাড়িটাতে একটা উদ্বেগ ছড়িয়ে দিল। জেনারেটারের ব্যবস্থা রাখতে ভোলেন নি সুমঙ্গলবাবু। গতে বাঁধা সাতটার লোডশেডিংটা শুরু হতেই চালু হয়ে গেল মুকুল ইলেকট্রিকালের জেনারেটার। মুকুল একটা ছেলেকে পাঠিয়েছে, নিজে আসেনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য সমস্ত বাড়িটা আলোয় ঝলমল করে উঠেই ডুবে গেল আবার অন্ধকারের গভীরে।

'ব্যাটা গেল কোথায়? শালাকে পেলে আর ছাড়ব না!'

এক বাড়ি লোকের মধ্যে ছোড়দা' খেঁকিয়ে উঠল।

জেনারেটার ব্রেক ডাউন হয়েছে। মুকুল যাকে বসিয়ে দিয়ে গেছে সে ব্যাটা কিংসু জানে

না। গেছে মুকুলকে খবর দিতে। হুড়মুড় করে দু'জন ছুটে এল অন্ধকারে। অনিমেষকে পাশ কাটিয়ে তারা সদর দরজার কাছে চলে গেল। সপাটে বন্ধ করে দিল দরজাটা। একটা তালা দেবারও আওয়াজ যেন শুনতে পেল সে।

'ঘিরে ফ্যাল চারদিকটা। যাবে কোথায়?'

সপ্তমে চড়ে ওঠা গলার স্বর চিনিয়ে দেয় দীপার কাকাকে, অন্ধকারের মধ্যেও।

অসতর্ক অনিমেষ এবার সজাগ হল। আধপোড়া সিগারেটটা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

সাড়া পাবার কোনও লোক খুঁজে পায় না। দীপার কাকা আর ঐ লোকটা চলে গেছে তড়িৎগতিতে। ঠোঁটের সিগারেটটা জানলার বাইরে যাবার আগেই। উদ্বেগ আর উত্তেজনা অনিমেষকে বুঝিয়ে দিল, কিছু একটা হয়েছে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটল নাকি? আঘাত পেল নাকি কেউ?

এরকম একবার অবশ্য হয়েছিল। পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল অনিমেষের পিসিমা, অন্ধকারে। পিউয়ের বিয়েতে। বিয়েবাড়ি থেকে সোজা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল অনিমেষকে। তবে কি সেরকমই কিছু একটা...?

তবে তার সঙ্গে ছুটে এসে দরজায় তালা দেবার কোনও কারণ খুঁজে পেল না অনিমেষ। ইকোনমিক্সে অনার্স অনিমেষ রায়ের শার্প ব্রেনটাও কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেল। সে বুঝে উঠতে পারল না, এ মুহূর্তে তার ঠিক কি করা উচিত। শুধু এটুকু বুঝতে পারল, গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। দীপার কাকার কণ্ঠে উদ্বেগ আর ভয়ের ছাপটাই ফুটে উঠেছিল।

(২)

বি.এ. পাশ করে দীপাকে বেশিদিন বসে থাকতে হয়নি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসে সুমঙ্গলবাবুর শালী। পাত্র স্থির হয়, দেখা-শুনা করে পছন্দ হয় দু'জনেরই। তবু অনিমা দেবীর ভয় ছিল তার মেয়েকে নিয়ে। দীপার খুঁতখুঁতে স্বভাবের সঙ্গে তার পরিচয় তো নিত্যদিনের। মেয়েকে তিনিই সবচেয়ে বেশি চেনেন। তাই এত সহজেই দীপা রাজি হয়ে যাবে, ভাবতেই পারেন নি। সব হিসাব উল্টে দিয়ে বিনা বাক্যে রাজী হয়ে গেল দীপা। দীপার মাসি টিপ্পনি কেটে বলল, 'চিনতিস্ নাকি আগে?'

পাত্রপক্ষ বা স্বয়ং পাত্র কোনও অন্যায় দাবী-দাওয়া করেনি। শুভ লক্ষণ দেখে সুমঙ্গলবাবু নিজেকে গুছিয়ে নেন তাড়াতাড়ি।

(৩)

'কি করে হল? কখন নিল? তুমি ছিলে না, বৌমা?'

সিঁড়ির উপর থেকে দীপার জ্যাঠার গলা শোনা গেল।

একটা প্রচন্ড অস্থিরতা অনিমেষকে সবকিছু জানার জন্য উদগ্রীব করে তোলে। কিন্তু ঘাড়ের উপর চেপে বসা জমাট অন্ধকার অনিমেষের সব অস্থিরতাকে দু'হাতে ঠেলে ধরে রাখে।

দো'তলা থেকে অনেকগুলো মানুষের কথা শোনা যাচ্ছে। অনিমেষ বুঝতে পারছে একবার দোতলায় যেতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু একতলার ঘর থেকে সিঁড়ির দিকে এগোতেই ডেকারেটারদের কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারটা ভাঁজ হয়ে সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। চেয়ার পড়ার শব্দে অনিমেষ নিজেই চমকে উঠল। চেয়ার পড়ার শব্দও যে এত তীব্র হতে পারে, অনিমেষের তা ধারণা ছিল না। আসলে এই ছুঁচবেঁধা অন্ধকারে মানসিক উদ্বেগ বুঝি অবাঞ্ছিত শব্দের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দেয়। পরিস্থিতি বুঝে, অনিমেষ আর এগোতে চাইল না। গ্রিল দেওয়া জানলাটার পাশেই সে দাঁড়িয়ে রইল।

'অজিত দা, ও অজিত দা, কোথায় গেলে তুমি? এদিকে একবার আসবে তো?'

একটা অচেনা কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

'এই যে ভাই শোন, কি হয়েছে? এতো চেঁচামেচি কিসের?'

'কে অজিত দা? ওঃ নাঃ, আপনি?'

অন্ধকারের মধ্যে অনিমেষকে ঠাহর করতে চায় ছেলেটা। গুমোট অন্ধকারে সবকিছু অস্পষ্ট।

'আমি অনিমেষ। কিন্তু হয়েছেটা কি?'

'অ্যাঁ! না, মানে দীপাদির গলার নেকলেসটা চুরি গেছে। অন্ধকারে ফাঁকতালে কে শালা গলা থেকে টান মেরে খুলে নিয়েছে। যাবে কোথায় মাল? দরজা সব বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু অজিত দা' কোথায়?'

'মানে! এটা হল কি করে? কি ভাবে টান মেরে...?'

'আর বলবেন না। সে এক কেলোর কীর্তি। অজিত দা, ও অজিত দা, ওফঃ! তুমি গেলে কোথায়?'

অজিত কে, অনিমেষ জানে না। ছেলেটা 'অজিতদা' বলে ডাকতে ডাকতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। অনিমেষ আবার একা দাঁড়িয়ে থাকল জানলাটার পাশে।

ভাবনার জালটা মাকড়সার জালের মত একটু একটু করে ছড়াতে থাকল অনিমেষের মনের মধ্যে। চেনা-জানা যে ক'জন আজ এখানে এ মুহূর্তে উপস্থিত, তাদের সবাই এসে একে একে মনের মধ্যে ভিড় জমাল। কে নিতে পারে নেকলেসটা? এ কোনও উটকো লোকের কাজ নয়। দীপার মাসির দেওয়া জড়োয়ার নেকলেসটা চার ভরির, চুনী-পান্না-মুক্তো বসানো, অনেক দাম, হাজার সত্তর টাকা তো হবেই। দীপার বিয়ের আগে থেকেই সে এই নেকলেসটার কথা শুনেছে। বিয়ের বাজার করতে গিয়ে ফেরার পথে দীপার মা গিয়েছিলেন অনিমেষদের বাড়িতে। সেখানেই নেকলেসের কথাটা বেশ গর্বের সঙ্গে শুনিয়ে এসেছেন তিনি। দীপার মাসির পয়সার অন্ত নেই। খরচও করে দু'হাতে। দীপার মেসোর ডান হাতে-বাঁ হাতে রোজগার। লোকে বলে, দীপার মাসির ভল্টে নাকি তাল তাল সোনা আছে। তা সেই মাসি তার একমাত্র আদরের বোনঝিকে জড়োয়ার নেকলেস দেবে, এতে আর আশ্চর্য কী। অনিমেষ মনে মনে দীপার ভাগ্যের তারিফ করে। দীপার সেই নেকলেসটাই কিনা চুরি হয়ে গেল আজ। এই

নেকলেস মাহাত্ম্য তো বাইরের কারও জানার কথা নয়। এসব ঘরোয়া আলোচনা আত্মীয়-স্বজনের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে যাবার নয়। তবে কি পরিবারেরই কেউ... আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই কেউ... নিমন্ত্রিতদের মধ্যে থেকেই...।

(৪)

বিয়ের রাতে এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে দীপার দিশেহারা মুখটার কথা ভাববার চেষ্টা করল অনিমেষ। দীপার আয়ত দীঘল চোখের মৃদু কম্পনও যেন দেখতে পেল অনিমেষ। এই কাঁপুনিটা অনিমেষের অনেক দিনের চেনা। খুব কাছ থেকে দেখা, বড় গভীরভাবে চেনা। অনিমেষের মনে পড়ে গেল আজ থেকে প্রায় বছর পাঁচেক আগের সেই বিকেলটার কথা। দলছুট মেঘের মত সেই বিকেলটা অনিমেষের জীবনের একটা অসম্পূর্ণ অধ্যায়। সেদিনই অনিমেষ প্রথম চুম্বনের স্বাদ অনুভব করে। দীপার উষ্ণ সাহচর্যে নিজেকে আবিষ্কার করে এক গভীর স্বপ্নের উপত্যকাব মাঝে। বক্ষ বন্ধনীতে হাত চলে গিয়েছিল অনিবার্যভাবে। পিঙ্গল বর্ণের যুগ্ম আগ্নেয়গিরির শিখর স্পর্শ করার আগেই দীপা তার পেলব ঠোঁট দুটো দিয়ে চেপে ধরেছিল অনিমেষের ইচ্ছাকে। এক চুমুকে শুষে নিয়েছিল অনিমেষের হৃদস্পন্দনকে। ঈশ্বরের বাগানের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অপরিসীম তাড়নায় দীপা সবকিছু ভুলে গিয়েছিল। অনিমেষও এমন আকস্মিক বন্যতার জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল না। দীপাকে সে ছোটবেলা থেকেই দেখছে। দুঃসম্পর্কের কি এক তুতো দাদা হয়েই তার এ বাড়িতে আগমন। কিন্তু আসা-যাওয়ার ঘনিষ্ঠতায় সে বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। দীপাকে নিয়ে সে কোনও দিন স্বপ্ন দেখেনি। হায়ার-সেকেন্ডারী পড়ার সময় দাদা সুলভ কর্তৃত্বে পড়াও দেখিয়ে দিয়েছে বেশ কয়েকবার। দীপাও যে অনিমেষকে নিয়ে খুব বেশি কিছু ভেবেছে, তা নয়। তবু বয়ঃসন্ধিক্ষণের গোপন চাওয়া-পাওয়াগুলো সে আর কারও কাছে মেলে ধরবার অবকাশ পায়নি। তাই সেদিন বিকেলে, ফাইনাল পরীক্ষার দিন চারেক পরেই হবে বোধহয়, একান্তে সে পেয়ে গিয়েছিল অনিমেষের আন্তরিক সঙ্গ। সেদিন অবুঝ মন সব ভুলে ডুব দিয়েছিল অনিমেষের মধ্যে। নিরাভরণ হয়ে সে সাঁতার কাটতে চেয়েছিল অনিমেষের দেহ সমুদ্রে।

সেদিন কথা হচ্ছিল, মানুষ চেনা নিয়ে। অনিমেষ তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটো নিয়ে অনেক কথা বলছিল। বলছিল,'মানুষ চেনা বড় দায়। তবু মানুষ চেনার একটা ইচ্ছা সব সময়েই মনের মধ্যে পায়চারি করে। এ দরজায় সে দরজায় কড়া নাড়ে। মস্তিষ্কে খবর পাঠায়, সঙ্গী হতে।'

দীপা বলে ওঠে, 'আমাকে তুমি কতটা চেন, অনিমেষ দা?'

'অনেকটা। এই এত্তোটা।'

অনিমেষ দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে পরিমাণটা বোঝাবার চেষ্টা করে।

দীপা সেই মুহূর্তে অনিমেষের প্রশস্ত বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাঞ্জাবীর বোতামগুলো একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, রোমশ বুকে ঠোঁটদুটো চেপে ধরে। বলে, 'কাঁচকলা। তুমি কিছু চেন না।'

আকস্মিক বন্যতায় বেসামাল হয়ে পড়ে অনিমেষ। অস্ফুট স্বরে সে বলে ওঠে, 'কি ভাবে

চিনব তোমায়।'

'যেমন ভাবে চিনে নিতে হয়।'

দীপাকে দু'হাতে বেষ্টন করে অনিমেষ খুঁজতে থাকে। এক দীপার মধ্যে অন্য আর এক দীপাকে। এ দীপাকে সে আগে কখনও দেখেনি। এই গহীন গাঙে ডুবে মরার তুমুল স্বাদ তার প্রতিটি রোমকূপে ছড়িয়ে পড়ে। ঘূর্ণি স্রোতে তলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সে একটা ধাক্কা খায়। গুরুমস্তিষ্ক থেকে একটা জরুরী বার্তা এসে পথ আগলে দাঁড়ায়। এই অসামান্য দুর্বলতার পরিণতির কথা ভেবে সে নিজেকে সংযত করে। আহত দীপা ফুঁসে ওঠে। অনিমেষের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বলে, 'তুমি একটা ভেড়ুয়া।'

তারপর বছর ঘুরে গেছে। অনিমেষ বিয়ে করেছে। বর্ধমানের মেয়ে সুদেষ্ণাকে; সন্ধানটা এনেছিল অনিমেষরই সেই কোমরভাঙা পিসিমা।

আজ দীপার বিয়ে। দীপাও চলে যাবে তার শ্বশুরবাড়িতে। নতুন ঘরে, নতুন মানুষের কাছে, এক নতুন সংসারে। সেই সংসার একান্তভাবে দীপার নিজস্ব সংসার। অনিমেষ প্রার্থনা করেছে, সে সংসার যেন সুখের হয়।

ইকোনমিক্সে অনার্স নিয়ে পাশ করেও অনিমেষ রায় ভালো চাকরি জোগাড় করতে পারেনি। বিয়ের পর থেকেই তাই শুরু হয়ে গেছে অশান্তি। অগুন্তি কথা শুনতে হয় তাকে এ নিয়ে। অনিমেষের বৌ সুদেষ্ণার প্রতিটি কথায়, আচার-আচরণে, মনের প্রতিটি কোণায় একটা চাপা ক্ষোভ সব সময়েই কাজ করে। অনিমেষ সুদেষ্ণাকে সুখ দিতে পারেনি। অনিমেষ নাকি সুদেষ্ণার সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। ওর কোনও ইচ্ছাই সে পূরণ করতে পারেনি,... ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিযোগের অন্ত নেই। একেক দিন কথা কাটাকাটি করতে করতে সুদেষ্ণা ফুঁসে ওঠে। অনিমেষের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বলে ওঠে, 'তুমি একটা ভেড়ুয়া।' অনিমেষের মনে পড়ে যায়, একদিন দীপাও তাকে এই কথাটা বলেছিল। সেদিনও সে দীপার স্বপ্নকে দ্বিধাগ্রস্ত হাতে ভেঙে ফেলেছিল। স্বপ্নভঙ্গকারী পুরুষেরা সবাই 'ভেড়ুয়া' হয়, অনিমেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় অকপটেই। অনিমেষ অনিবার্যভাবেই বিবাহিত জীবনে তাই শান্তি পায় নি। দীপার ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক্, তা সে চায় না। দীপার সংসার সুখে-স্বচ্ছন্দে ভরে উঠুক, এই প্রার্থনাটাই অনিমেষ আজ করছে বারে বারে। আর যাই হোক, দীপার বর যেন অনিমেষের মত 'ভেড়ুয়া' না হয়।

(৫)

একটা খুট্ করে শব্দ হল সিঁড়ির কাছে। সম্বিত ফিরে পেল অনিমেষ। এককালে গোয়েন্দাগিরি করার একটা গোপন ইচ্ছা ছিল মনে। কিন্তু কি ভাবে কি শুরু করবে, কোথায়ই বা প্রশিক্ষণ নেবে, এসব খোঁজ নিতে নিতে মন থেকে সেই ঝোঁকটাই চলে গেল। রহস্য সন্ধানী বলে বন্ধুমহলে অনিমেষের একটা পরিচয় ছিল। দীপাও এই ব্যাপারটার কথা জানত। সে মজা করে প্রায়ই বলত, 'এই যে টিকটিকিদা চলে আসুন।'

সেই দীপার নেকলেস অপহরণকে কেন্দ্র করে অনিমেষের মাথায় [illegible] অনেকগুলো

টিকটিকি টিক্-টিক্ করে উঠল। গোয়েন্দাগিরির ভূতটা আবার মাথায় চেপে বসল এই অন্ধকারেই। মনে মনে বলে উঠল, 'এটাই আমার প্রথম কেস।' বলতে বলতে কপালে ভাঁজ পড়ে গেল। পরক্ষণেই হেসে ফেলল। মনে পড়ে গেল, তাকে কেউ নেকলেস উধাও রহস্যের জট ছাড়াবার দায়িত্ব দেয়নি। তবে সে যদি নিজে থেকেই এই রহস্যের কিনারা করতে চায়, তবে কারও কোনও আপত্তি থাকবে বলে তো মনে হয় না। অন্তত দীপার এতে সায় থাকবে বলেই তার বিশ্বাস। সুতরাং মালকোঁচা বেঁধে নেমে পড় তদন্তে। খুঁজে বের কর কালপ্রিটকে।

একে একে রহস্যজনক মুখগুলো অনিমেষের মুখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রথমেই যার কথা মনে হল অনিমেষের, তিনি হলেন দীপার ছোটমামা। তার অভাবক্লিষ্ট মুখ আর ধূর্ত চাউনি দেখে শুধু শুধুই কেন জানি না তাকে অপরাধী বলে মনে হয়। আরও মনে পড়ে গেল অজয়দার কথা। তার রেস খেলার বদ অভ্যাসের কথা কে না জানে।

দীপার ছোট মামার একটা ছাপাখানা আছে। অনিমেষ শুনেছে, তার হাল এখন খুবই খারাপ। অন্যান্য অফসেট মেশিনের চাপে পড়ে তার ধুলো-ধোঁয়া মাখা পুরনো তেলচিটে মেশিনগুলো আজ অচল হয়ে যাবার মুখে। বিশেষ কোনও কাজের মুখ আজকাল আর তারা দেখে না। কেউ আর লেটার প্রেসে কিছু ছাপতে চায় না। সুতরাং তার পক্ষে নেকলেসটা পেলে খুব সুবিধাই হবে বলে মনে হয় অনিমেষের। কারণ পরিমলবাবু একদিন বলেছিলেন,-'যে করেই হোক, বিজনেসটা এবার দাঁড় করাতেই হবে। কিন্তু প্রবলেমটা হল 'মানি'। উপস্থিত হাজার সত্তর টাকা হলেই হয়ে যায়, বুঝলে বাবা অনিমেষ।'

'হি মে বি এ কালপ্রিট। হি ক্যান ডু সাম ক্রাইম।' অনিমেষ মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করল।

এরপর ঐ রেসুরে অজয়দা'র কথা মনে পড়ে গেল। দীপার জ্যাঠা বলেন, 'ব্যাটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' কিন্তু অজয়দা' আর যাই হোক, বোকা নয়। অজয়দা' জানে, চুরি হলে সমস্ত সন্দেহটা তার ঘাড়েই পড়বে। রেসের মাঠে যায় বলে সকলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। সোজাসুজি তার দিকে এরা কেউ তাকায় না। সবাই অজয়কে আড়চোখে দেখে। তাছাড়া রেসের মাঠে পকেটমানি বিসর্জন দিয়ে এলেও, উড়িয়ে দেয়নি তার মানবিকতাকে। দীপা তার নিজের বোন। সেই দীপার বিয়ের নেকলেস সে ঘোড়ার মাঠে বাজি রাখতে পারবে না। অন্তত অনিমেষের মানুষ চেনার ক্ষমতা তো তাই-ই বলে।

তবু একটা কিন্তু কিন্তু ভাব অনিমেষ মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনা। তাই অজয়দা'কেও সে সন্দেহেব তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলতে পারে না।

বাকি থাকে আর একজনই। সে হল এ পাড়ারই স্বর্ণেন্দু বণিক। দীপার গোপন প্রেমিক। তবে প্রেম নিবেদনটা নেহাতই একপেশে হয়ে গিয়েছিল। দীপার যে এতে কোনও সায় ছিল না, সেটা বুঝতে স্বর্ণেন্দু অনেক দেরী করে ফেলে। দীপা ছাড়া বাড়ির আর কেউই এই ব্যর্থ প্রেমের করুণ ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। অনিমেষও কিছু জানতে পারত না, যদি না দীপা একদিন স্বর্ণেন্দুর চিঠিগুলো অনিমেষকে দেখাত। অনিমেষ স্বর্ণেন্দুর হয়ে সওয়াল করলে দীপা তাকে বলেছিল,—'সবাইকে সব কিছু দেওয়া যায় না। দিতেও নেই।'

সেই স্বর্ণেন্দু আজ এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত। সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে তাকে একবার দীপার ঘরেও ঢুকতে দেখেছে অনিমেষ। তবে কি স্বর্ণেন্দুই প্রতিহিংসার বশে এই কাজ করে বসল! অনিমেষ কোনও সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে আঙুল দিয়ে নিজের কপালেই দু'তিনটে টোকা মারল। একটা গভীর শ্বাস নিয়ে সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল—হ্যাঁ, এই তিনজনের একজনই কালপ্রিট।

অন্ধকার এখনও কাটেনি। কারেন্ট আসেনি এখনও। জেনারেটারের মালিক মুকুল এসেছে কিনা, অনিমেষ জানে না। তবে বন্ধ জেনারেটার চালাবার কোনও শব্দ সে এখনও শুনতে পায়নি। কিন্তু আলো না এলে এই রহস্যের কিনারা করা একেবারেই অসম্ভব। আলো এলে অনিমেষ একবার দীপার ঘরে যাবে। স্পট অবজারভেশনের একটা প্রয়োজন আছে এক্ষেত্রে। তাছাড়া দীপার মুখ থেকে সবটা শুনতে হবে। দীপাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে এ বিষয়ে। পরের মুখে ঝাল খেয়ে রহস্যভেদ করা যায় না।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা ছোট্ট বাতির মৃদু আলো অনিমেষ যে ঘরে অনেকক্ষণ একা দাঁড়িয়ে আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করল। তারপর হঠাৎই সেই আলোটা নিভে গেল। অনিমেষের মনে হল, আলোর কাণ্ডারীই যেন এক ফুঁয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকারের মধ্যেই সে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পা টিপে টিপে খুব সতর্কভাবে কেউ এগিয়ে আসছে। শব্দটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, অনিমেষকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে। এদিক দিয়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে যাবার এই একটাই দরজা।

খুট্ করে মৃদু শব্দে সেই দরজার ছিটকিনিটা খুলে যায়। সতর্ক হাতে কে যেন খিলটাও খুলে ফেলল। কিন্তু দরজা খোলে না। অনিমেষের মনে পড়ে গেল দীপার কাকার সেই তালা দেবার মৃদু শব্দটা। অনিমেষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে জানিয়ে দিল, অপরাধী তার তিন ফুটের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। টানটান হয়ে উঠল অনিমেষ। হাত দুটো পকেটে চলে গেল। ডান পকেটে সে খুঁজে পেল দেশলাইয়ের বাক্সটা। জাহাজের ছবি আঁকা 'শিপ কার্বোরাইজড্' দেশলাই সে বরাবর ব্যবহার করে। লাইটার তার ধাতে পোষায় না।

এতক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে থাকতে থাকতে চোখটাকে অন্ধকারের সঙ্গে অনেকটা সইয়ে ফেলেছে অনিমেষ। একটা মানুষকে সে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে সেই মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে। এই ছায়ামূর্তিই যে নেকলেস চোর, এটা বুঝতে অনিমেষকে আর গোয়েন্দাগিরি করতে হয় না। পালাবার একমাত্র পথ বন্ধ দেখে সে বন্ধ দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দমবন্ধ করে অপেক্ষা করছে। তার অসহায়তা যেন এই অন্ধকারের মধ্যেও প্রকট হয়ে উঠেছে।

কেমন যেন একটা মায়া অনুভব করল অনিমেষ। মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। তার সেই কালপ্রিট এখন তার সামনে, কয়েক হাতের মধ্যেই। অনিমেষের চেনা কেউ, পরিচিত কেউ। ঐ তিনজনের একজন। কিংবা অন্য কেউ। কিন্তু এভাবে হাতেনাতে তাকে ধরে ফেলা, এই বিয়েবাড়িতে, এত লোকের মাঝে ... কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে লাগল অনিমেষের। কিন্তু দীপার নেকলেস, তার আয়তচোখের থিরথিরানি, সুমঙ্গলবাবুর টেনশন, বাড়িশুদ্ধ লোকের উদ্বেগ আর সবকিছু ছাপিয়ে অনিমেষের প্রথম কেস সমাধান করার উত্তেজনা... না,

অনিমেষ আর সহ্য করতে পারছে না। এক ঝটকায় সে হৃদয়ের কোমল মনোবৃত্তিটা ঝেড়ে ফেলে, কঠিন কর্তব্যবোধটাকেই আঁকড়ে ধরল। অভ্যস্ত নিপুণতায় দেশলাইয়ের কাঠিটা ঝলসে উঠল অনিমেষের হাতে।

দেশলাই কাঠির মৃদু লালাভ আলোয় যার সন্ত্রস্ত মুখটা অনিমেষের চোখের সামনে ভেসে উঠল, তার শুধু মুখ কেন, তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অনিমেষের চেনা; দেহ সমুদ্রে ডুব সাঁতার দিয়ে ডুবুরির মত গহনে গভীরে চেনা। দেশলাইয়ের মৃদু আলোতেও ঝলমল করছে নেকলেসটা। বুকের উপর চাপা দেওয়া কাপড়ের ফাঁক দিয়েও সেই জড়োয়ার নেকলেসটা ঝলমল করছে, আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে। সেই আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে অনিমেষের।

অস্ফুট স্বরে অনিমেষ বলে উঠল, 'সুদেষ্ণা, তুমি!'

দু'চোখের দৃষ্টিতে তীব্র ভৎর্সনা মাখিয়ে সুদেষ্ণা বলে উঠল, 'তুমি একটা ভেড়ুয়া!'

নয়না

ট্রেনটা শ্রীরামপুব ছেড়ে সবে একটু এগিয়েছে।

প্ল্যাটফর্মেব বড় বড় নিওন আলোর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে চোখটা আবাব অন্ধকারে গেঁথে যাচ্ছে। পকেট হাতড়ে গোল্ডফ্লেকটা বের করলুম। বেশীরভাগ দিন এ সময় 'চারমিনার'-ই ধরাই। আজ মাইনে পেযেছি কিনা, তাই কিঞ্চিৎ বিলাসিতা।

ছোট ছোট কুন্ডলী পাকানো ধোঁয়াগুলো আমার কেবানি মার্কা নাকের ফুটো দিয়ে ফুক্‌ফুক্ করে বেবিয়ে, খোলা জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। বড় আয়েস করে একটা টান দিয়ে কম্পার্টমেন্টের ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। উল্টোদিকের জানলার ধারে এক ভদ্রলোক স্টেটস্‌ম্যানের এডিটোরিয়াল কলামটা খুঁটিয়ে পড়ছেন। নাকের ওপরে চশমাটা একটু ঝুলে পড়েছে। সেভিং করা গালে দু-চারটে ব্রণর দাগ। কপালটা অনেকক্ষণ ধরেই কুঁচকে

আছেন, অকারণেই। ভদ্রলোকের রিস্টওয়াচের ডায়ালটা বেশ বড়। এখান থেকেও দেখতে পেলাম। এগারোটা বিয়াল্লিশ।

ব্যান্ডেল লোকাল। লাস্ট ট্রেন। আজ একটু দেরী হয়ে গেল। রোজ এর আগের ট্রেনে ফিরি। ওভারটাইম সেরে ক্যাশ ড্র হতে হতেই দশ'টা বেজে গেল। তা হোক, টাকা নিতে একটু দেরি হলে কোনও ক্ষতি হয় না। এবারের টাকাগুলোর বেশির ভাগই নতুন। কড়কড়ে নোটগুলো ইনসাইড পকেটটা ভারি করে রেখেছে। অফিসমুখো বাঙালির মাসের এই দিনটা বেশ সুখের। আজকের এই দিনটায় অফিস যেতে ভালো লাগে, কাজ করতে ভালো লাগে। ক্লিপটা খুলে, জামাটা প্যান্টের ভেতরে ভাল করে গুঁজে, আবার ক্লিপটা আটকে, একটু 'স্মার্ট স্মার্ট' ভাব নিয়ে ম্যানেজারের ঘরে ঢোকার মুহূর্তটা আরও ভালো লাগে। টাকাটা হাতে নিয়ে, 'থ্যাঙ্কস' কথাটা বলার সময় কেমন যেন বেশ খুশি খুশি লাগে। দশদিন ধরে জমে থাকা ফাইলটা কালকেই খালাস করে দেবার একটা ইচ্ছা এসে যায়। অবশ্য পরদিন অফিসে এসে যে কে সেই। আনন্দবাজারটা টেবিলের ওপর ফেলে, ভৌমিকদার সঙ্গে আধঘন্টা গেঁজিয়ে না নিলে, কাজে ঠিক্ মন বসতে চায় না।

শেওড়াফুলি আসছে। বড় বড় জোরালো আলোগুলো আবার চোখে পড়ছে। জংশন। তবু এত রাতে এই স্টেশনেও লোক নেই বললেই চলে। মোবাইল বুক-স্টলগুলো ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। পরিশ্রান্ত কুলিগুলোর মধ্যে একটা অবসন্নভাব। রাত গভীর হয়ে আসছে। বেওয়ারিশ ভিখারিগুলোর চোখেও ঘুম নেমে আসছে।

লাস্ট ট্রেন। ব্যান্ডেল লোকাল। কেউ উঠছে না এ কামরাটায়। একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধ পরিবেশ। আলো ঝলমলে শেওড়াফুলি জংশন। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কম্পার্টমেন্টটা নড়ে উঠল। ঐ তো, একটা শরীর ছুটে আসছে। এলোমেলো পায়ে, ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। কোন্ কম্পার্টমেন্টে উঠল, বুঝতে পারলাম না। একটু একটু করে শেওড়াফুলি ছাড়িয়ে আবার অন্ধকার। মাঝে মাঝে কয়েকটা বাড়ির জানলার ফাঁক দিয়ে কতকগুলো আলো চোখে পড়ে। তাও খুব বেশী নয়। সিগারেটটা ফুরিয়ে এসেছে। বেশ জোরে একটা শেষ টান মেরে জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিলাম। হাতটা পকেটে চলে গেল। আর একটা ধরাব। ওপাশের ভদ্রলোক এখনও পড়ে চলেছেন, স্যাটারডে স্টেটস্ম্যান।

হাতদুটো কাছে আনলাম দেশলাইটা ধরাব বলে। অভ্যস্ত হাতে আগুন জ্বালিয়ে মুখটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলাম। হঠাৎ দুজনের কম্পার্টমেন্টে নতুন কারও আগমনে চোখদুটো সামনের দিকে চলে গেল। একটা মেয়ে, বেশ লম্বাটে গড়ন, অনেকটা আমার মতই হবে, ঢুকে পড়ল আমাদের খোপটায়। কেমন যেন একটা দ্বিধা আর জড়তা নিয়ে চেয়ারের হ্যান্ডেলটা ধরে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়েই বসে পড়ল। যেন এখানে বসতে আমাদের একটা অনুমতি নেওয়া দরকার। হঠাৎ আঙুলে গরম ছ্যাঁকা খেতেই চমক উঠলাম। একটা অস্ফুট 'উঃ' বললাম। মেয়েটার কানে গেল কিনা, কে জানে। মেয়েটাকে দেখতেই ব্যস্ত ছিলাম, জ্বলন্ত

কাঠিটা আর নেভানো হয়নি। হাত ফসকে সিগারেটটা নিচে পড়ে গেল।

এই আকস্মিক ঘটনায় কিরকম একটা লজ্জা লজ্জা করতে লাগল আমার। খানিক চুপ করে বসে থাকলাম, বাইরের দিকে মুখ রেখে। যেন ভারি মনোযোগ দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি। দেখব আর কি, চারদিকেই তো জমাট অন্ধকার। তবু তাই-ই যেন দেখছি, বড় নিবিষ্ট মনে। তারপর আবার পকেট হাতড়াই। বাঁদিকের পকেটটায় লাল সুতোর বিড়ির বাণ্ডিলটা আছে। বিড়িটাই ধরানো দরকার। ছা-পোষা কেরানি মানুষ, ঠিক করেছি দিনে ছ'টার বেশি সিগারেট খাব না। পড়ে যাওয়া সিগারেটটাই আজকের দশম। আজ একটু বেশী হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে বিড়িই ধরাতাম। কিন্তু মেয়েটার সামনে বিড়ি ধরাতে কেমন যেন একটা ইয়ে ইয়ে লাগল। অগত্যা বুক পকেট থেকে গোল্ডফ্লেকটাই। এবার আর ভুল নয়। অভ্যস্ত নিপুণতায় কাঠিটা জ্বলে উঠল। জানলার বাইরে ধোঁয়াটা ছাড়লাম।

চোখদুটো জানলার বাইরে রাখতে চেষ্টা করলাম। বেশিক্ষণ পারলাম না। আড়চোখে দু'একবার মেয়েটাকে দেখে নিলাম। মনে হল যেন মুচকি মুচকি হাসছে। হাসিটার অর্থ বোধগম্য হল। ভেতরে ভেতরে লজ্জায় একেবারে মরে গেলুম। মনে হল মেয়েটা একবার কম্পার্টমেন্টের মেঝেতে পড়ে থাকা সিগারেটটার দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার আমার মুখের দিকে। চোখ দুটোকে বারে বারে ঠেলে বাইরের ঐ গুমোট অন্ধকারে নিয়ে যেতে যেতে কেমন যেন আর পারলাম না। হেসে ফেললাম, সোজা মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে। মেয়েটাও যেন হাসছে বলে মনে হল। ঠোঁটের কোণে 'তিরতিরে' হাসি। ভালো করে বোঝা দায়। মনে মনে বুঝে নিতে হয়।

"ট্রেনটা আজ লেট করছে বোধহয়।" বোকার মত একটা ফালতু কথা বলে বসলুম। কাকে বললুম, কে জানে। বোধহয় মেয়েটাকেই। ওপাশ থেকে একটা রিনরিনে মেয়েলি গলায় কিছু একটা জবাব যে আশা করিনি, তা নয়; তবু একথার বোধহয় কোনও জবাব হয় না।

"নাঃ, কারেক্ট টাইমে রান করছে।" একেবারে ওধারের জানলার কাছ থেকে একটা ভারি গলা ভেসে এল। হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি অবধি এই প্রথম ভদ্রলোক, মানে 'মিস্টার স্টেটস্‌ম্যান' সরব হলেন। সেই হাওড়া থেকেই উনি একমনে স্টেটসম্যানটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন দেখে, ওনার নামই দিয়ে ফেললাম "মিঃ স্টেটস্‌ম্যান"। মনে মনে বেশ একটা মজা পেলাম। চলার পথের এসব অচেনা মানুষগুলোর সবাই হয়ত স্মৃতির অ্যালবামে ঠাঁই পায় না। তবু ওদের কয়েকজনকে বেশ ভালো লাগে। তখন মনে রেখে দিই। তারপর আবার সময়ের স্রোতে, ঘটনার পট পরিবর্তনে আরও একটা স্মৃতি এসে পুরনোটাকে সরিয়ে ফেলে। ফুলদানিতে ফুল রাখার মত। ভারি অদ্ভুত লাগছে এই ভদ্রলোককে। আপাতত আমার মনের ফুলদানিতে উনি একটি টাটকা ফুল। তবে কদ্দিন টাটকা থাকে, সেটাই দেখার।

চোখদুটোকে বাইরের দিকে রাখতে পারছি না। তাকিয়ে আছি মেয়েটার দিকে, সোজাসুজি। একদৃষ্টে। মেয়েটাও কি বুঝছে কে জানে, ঠায় তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখদুটো একটু ভেতর দিকে ঢোকা। মুখটা খুব সাধারণ। তবু কেমন যেন একটা 'চট্ করে ভালো লেগে যায়'।

হাত পা গুলো রোগা রোগা; ঠিক যেমনটা হলে ঐ মুখের সঙ্গে খাপ খায়। অনেকক্ষণ ধরে সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরে আছি। খাওয়া হচ্ছে না, সেদিকে একবার খেয়াল হতেই, তড়িঘড়ি একটা টান দিলাম। ধোঁয়াটা মুখের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ভাবছি নাক দিয়ে বের করব কিনা। ভাল করে চেয়ে দেখি, মেয়েটার ধারাল নাকের পাটাটা একটু একটু কাঁপছে। কবিরা যেটাকে বলে 'থিরথিরে কম্পন', অনেকটা সেরকমই। কিছু একটা বলতে চায় কি? আমাকে? চোখের পাতাদুটোর মধ্যে কেমন যেন একটা ঝকঝকে ভাব। একটা আমন্ত্রণ, আলাপ করার। মুখটা নামিয়ে নিল কি ভেবে। ভুরুটা একটু ওপর দিকে তুলে বাইরেটা দেখতে চেষ্টা করল। এতক্ষণ খেয়াল করিনি। অনেকটা চলে এসেছি। গাড়ি ভদ্রেশ্বরে ঢুকছে। মেয়েটা একটু নড়ে চড়ে বসল। মেয়েটা নেমে যাবে, না কি? এখানেই নেমে যাবে? এত তাড়াতাড়ি?! বড্ড রাগ হল, আবার মনে মনে লজ্জাও পেলুম। মেয়েটার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকা। ভারি অস্বস্তিতে পড়ে গেছে নিশ্চয়ই। হয়ত এটা ওর স্টেশন নয়। নেমে গিয়ে অন্য কোনও কম্পার্টমেন্টে উঠবে।

গার্ডের হুইসেল বেজে উঠল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটা নামেনি। বসে আছে একইভাবে, একই জায়গায়। চোখদুটো সটান আমার দিকে রেখে, সেই আগের মত। একটা আমন্ত্রণী ইঙ্গিত, আলাপ করার। কেমন যেন মেয়েটাকে বেশ ভালো ভালো লাগছে। মনে মনে যেন ভালোবেসে ফেলেছি। বড় লোভী, বড় দুর্বিনীত এর প্রকাশ। মেয়েটা ট্রেন থেকে নেমে যায়নি। রয়ে গেছে। রয়ে গেছে আমারই সঙ্গে—আমার মনের সঙ্গে, আমার সমস্ত শরীরের সঙ্গে শরীরের কাছে। এহেন রোমান্টিক সিচ্যুয়েশনে যা হোক একটা কবিতা বা গান মনে করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আমার অস্থিরতা আর অসহায়তা যেন ক্রমশ আমার দু'চোখে ফুটে উঠছে। মেয়েটা তাকিয়ে আছে সেই চোখ বরাবর। ওর চোখদুটোকে এ মুহূর্তে গীতাঞ্জলির পাতা বলে মনে হচ্ছে। যেন আমাকে কোনও একটা লাইন খুঁজে দিতে চেষ্টা করছে, আপ্রাণ। পরপর উল্টে যাচ্ছে পাতাগুলো। একটার পর একটা। পাতাগুলো প্রথমে সাদা, তারপর আস্তে আস্তে কালো হরফগুলা ফুটে উঠছে; 'ওর চোখের পাতার মত, কেঁপে কেঁপে।

''আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ে,...।''

মেয়েটার ঠোঁটের পাতা কাঁপছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার সঙ্গে, একই সঙ্গে, সেও বলছে একই কথা, মনে মনে।

''আমি ব্যান্ডেলে নামব, আপনি?'' মনের প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম চোখের তারায়। বুদ্ধিদীপ্ত চোখের পাতা দুটো বুজে গেল। সেই হাসিটা নিয়ে ঘাড়টা একটু হেলে পড়ল একধারে।

''আমিও।'' ছোট্ট জবাব সে আমায় দিল, মনে মনে, চোখে চোখে।

প্যাকেটের লাস্ট সিগারেটটা বের করি। ভুরুটা তুলে, মুখটা একটু বেঁকিয়ে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর অনুমতি চাই। সলজ্জ চোখদুটোতে এক মুহূর্তেই অনুমতি মিলে যায়। শিপ্ কার্বোরাইজড়টা জ্বলে ওঠে, আরেকবার। মানকুন্ডু আসছে। ধোঁয়াটা বাইরে ছেড়ে জিজ্ঞাসা করি, "আমি অর্ণব মিত্র, আপনি?"

রহস্যময়ীর ঠোঁটের হাসিটা একটু চওড়া হয়। গভীর চোখদুটোতে একটা দুষ্টুমির ছায়া খেলে যায়। ভাবটা এমন, "বলবো কেন?"

"আচ্ছা বেশ, তাই না হয় হল, আপনি হলেন পথিক। পথিক? পথিক শব্দটির স্ত্রী লিঙ্গটা কি, এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। যা হোক, ওটা বৈয়াকরণদের মাথাব্যথার বিষয়, আমার নয়।" মনে মনে নিজেকেই সান্ত্বনা দিই। আমাদের আলাপন গড়িয়ে চলে, সময়ের সঙ্গে, ট্রেনের চাকার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

আমাদের কথা; মনে মনে, চোখে চোখে। এক অব্যক্তর পরিব্যক্ততা। শিল্পীর তুলির সঙ্গে রঙের অভিসার। ফুটছে, কথাও বলছে। তবে সে শুধু শুনতে পায় ক্যানভাসে আর শিল্পীর চোখ। আমরা কথা বলছি, চোখে চোখে, মনে মনে।

"ব্যান্ডেলে থাকেন কোথায়? ওলাইচন্ডীতলার দিকে নাকি?" আবার একটা জিজ্ঞাসা আমার চোখের কোণে ঝিলিক মারে। প্রশ্নটা ধরতে পেরেছে। মেয়েটা মাথা নাড়ছে। একটু একটু, এদিক ওদিক। তার মানে ওখানে থাকে না।

"তবে কোথায়?"

উজ্জ্বল চোখদুটো এবার একটু বড় বড হল। ঠোঁটের হাসিটা চোখের কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। যেন আমাকেই পাল্টা জিজ্ঞাসা, "বলুন তো কোথায়?" তা এরকম রহস্যময় ছেলেমানুষী দেখে এবার আমার ঠোঁটেই হাসি ফুটে উঠল। নারী চিরকালই রহস্যময়ী, সব বোধ চেতনার উর্ধ্বে।

আমাদের মনের মধ্যে কথার ঝড় বয়ে গেল। আমাদের দু'চোখে তারই প্রকাশ। ক্ষণিকে, ক্ষণিকে, দ্যুতিতে দ্যুতিতে, তারই প্রকাশ। চোখের কোণে, চোখের মণিতে। মুখের সঞ্চালনে, মনের সঞ্চালনে। কখনো প্রশ্নকর্তা আমি, উত্তর দিচ্ছে মেয়েটা। আবার কখনো আলো আঁধারি মাখা বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাকেই, সে এক ভীষণ ভালোলাগার অনুভূতি। ভাষায় বোঝানো যায় না।

কি নাম দেওয়া যেতে পারে এর? চোখে চোখে যেভাবে আমাদের কথা চলছে, তাতে একে 'নয়না' নামটা দিলে মন্দ হয় না। এক এক সময় ইচ্ছা করছে বড় আদরে, বড় সোহাগে, এ নামে 'ওকে আমি ডাকি। আবার মনে হল, কি হবে এভাবে এক শিরশিরে ভালোলাগাকে, এক অস্ফুট ভালোবাসাকে কঠিন বস্তুগত নামের বন্ধনে বেঁধে রেখে? সান্নিধ্য উপভোগটাই বড় কথা। সান্নিধ্যের পরিচিতিটা বড় নয়।

আমার চোখদুটো আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। চোখের পাতায় কথা ভর করে আসছে।

"আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। ইচ্ছা করছে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি।" আমার

দু'চোখে বন্ধুত্বর উদাত্ত আহবান। 'ইচ্ছা করছে আপনার সঙ্গে গল্প করি, আপনাকে ভালোবাসি। করবেন নাকি বন্ধুত্ব?"

চোখদুটোতে আবার হেঁয়ালি। "আপত্তি নেই।" নিবিড় চোখের ঢেউটা যেন কথা বলে উঠল। সম্পর্ক গড়ার একটা ইতিবাচক ইঙ্গিত 'ওর দু'চোখের মাঝে আমি দেখে নিয়েছি। 'ও ধরা পড়ে গেছে। আমার কাছে, আমার চোখে, আমার মনে, আমার ভালোবাসায়। আমার দু'চোখে একটা কিছু পেয়ে যাবার আনন্দ। অনেক প্রত্যাশার, অনেক ইচ্ছার একটা সাকার উপহার। মেয়েটা এইমাত্র দিল আমাকে।

মানকুণ্ডু পেরিয়ে এসেছি। এবার চন্দননগর। আবার আলো; জানলা গলে গাড়ির মধ্যে, চোখের মধ্যে, মনের মধ্যে। 'চা গরম'। গলাটা শোনা যাচ্ছে, একটু দূরে। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে, এদিকেই। কোনদিনই এ সময় চা খাই না। বাড়ি গিয়েও নয়। ভাত খেয়েই ডাইভ, সোজা বিছানায়। আজ মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে একটু চা হলে জমবে ভাল। কি বলেন? বেশ গরম গরম চা। ঠোঁটে ঠেকিয়ে চোখাচুখি; একটা কথা ছুঁড়ে দেব আমি, লুফে নেবে সে, চোখে চোখে। তারপর তার পালা, দেবার। আর নেব আমি, গরম চা'টা ঠোঁটে ঠেকিয়ে। দু' আঙুল দিয়ে ধার থেকে চেপে ধরা ভাঁড়টা সামনে তুলে ধরি।

"খাবেন নাকি?" অনুমতির অপেক্ষা করি না। অপেক্ষা করতেও নেই, অন্তত এসব ক্ষেত্রে। জানলার বাইরে নাক বাঁকা চা-ওয়ালাটা খুচরো গুনছে।

"এই যে ভাই, আর এক কাপ।" তড়িৎগতিতে কেটলি থেকে ঢেলে দেওয়া চা-টুকু, গরম ভাঁড়ে, হাতে নিয়ে, মেয়েটার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হালকা কালো ভুরু আর চোখের যুগলবন্দীতে সেই অতি পরিচিত শব্দটাই প্রতিফলিত হয়। "থ্যাঙ্কস"।

মাটির ভাঁড় থেকে উঠে আসা গরম বাষ্পে ভিজে যায় আমাদের চোখের পাতা ধুয়ে মুছে যায় সব বাধা, সব লজ্জা, সব ভয়। 'ওর চোখের মণির মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আমার মন, আমার শরীর, আমার সবকিছু।

ইচ্ছা করছে সমস্ত শরীরটা নিয়ে ছুটে যাই 'ওর কাছে। সমস্ত মনটাকে পথ করে দিই, এগিয়ে যেতে। উঠে গিয়ে বসি না 'ওর পাশে? কিছুক্ষণ পাশাপাশি, ঘেঁসাঘেঁসি করে। বসে থাকি দুজনে, দুজনার হয়ে। ট্রেনের ঝাঁকুনির সঙ্গে মতলব করে দুর্বল মুহূর্তে হাতে হাত ঠেকা। কিংবা 'ওর ঝুমকো দোলানো কানের পাশে মুখ এনে বলতে ইচ্ছা করে কিছু কথা। হয়ত নেহাতই তুচ্ছ কোনও কথা, যার না আছে অর্থ, না আছে সঙ্গতি। হয়ত যার কোনও প্রয়োজনও নেই। আবার কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে ট্রেনের ঝাঁকুনির সঙ্গে আরও একবার মতলব করে গবম ঠোঁটের পাতা দুটো লক্ষ্যচ্যুত করে দেবার প্রবল বাসনাটাকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। 'ওর হালকা গোলাপী ঠোঁটের থিরথিরে কম্পনটা এবার আমার ঠোঁটেও ধরা পড়ে গেছে। উঠে দাঁড়াই। 'ওর পাশে বসবো। "আঃ!" আচমকা ওধারের স্যাটারডে স্টেটস্‌ম্যানের পাতা উল্টানোর শব্দটা যেন আমাকে ধাক্কা মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি বসে পড়লাম নিজের জায়গায়, আবার। দাঁতে দাঁত চেপে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাই। পুরনো

ব্রণর দাগগুলো। ঝুলে পড়া চশমাটা আবার নিজের জায়গায় চলে এসেছে। ভদ্রলোক পড়ছেন, স্যাটারডে স্টেটস্‌ম্যান। মন দিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কোথায় একবার পড়েছিলাম, যৌনতার পরিমন্ডল খুবই ছোট। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে কথাটা মিথ্যে। আজ এই যে মেয়েটার মুখোমুখি বসে থাকা, মেয়েটার চোখের ওপর চোখ রাখা, মেয়েটাকে ভালোবাসা, সর্বোপরি উঠে গিয়ে এই যে পাশে বসার দুর্নিবার ইচ্ছেটা; এ সবই সেই ঈশ্বরের বাগানের নিষিদ্ধ ফল পেড়ে খাওয়া। এক এক মুহূর্তে এক এক ভঙ্গিমায় সেই একই ঘটনার আত্মপ্রকাশ।

বুঝতে পারছি, এ মুহূর্তে আমি পুরোপুরি প্রথম রিপুর হাতে ধরা পড়ে গেছি। ছাড়িয়ে আসতে পারব না, ছাড়িয়ে আসতে চাইও না। আমার শরীর, আমার তপ্ত যৌবন, যৌবনের প্রতিটি উষ্ণকণা আমার চোখের মণিতে ফুটে উঠছে। টগবগ করে। সেই নিষিদ্ধ ছায়াটা চোখের দুই পল্লবের ঘেরাটোপে ক্রমশঃ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। মেয়েটার গায়ে আমার গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। আমার চোখের ভাষা সে বুঝতে পেরেছে। 'ওর চোখদুটোতে আবার সেই হেঁয়ালি। ধরা দিয়েও ধরা না দেবার দুষ্টুমিটা খেলা করছে।

'ওর চোখের ভাষাটা এ মুহূর্তে দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। এতক্ষণ যার প্রতিটি ইচ্ছা, প্রতিটি ইঙ্গিত, দু'চোখের সমস্ত ভাষা আমার কাছে খুব সহজ সরল ছিল, নিষিদ্ধ ফল স্পর্শ করাব মোহে সে সব কিঁছুই মুহূর্তে কেমন ঘোলাটে, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার দু'চোখে আমাব প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। আমার স্বপ্নের, আমার ইচ্ছার কোন সাকার রূপদানের মনোভাব তার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। হয়ত ইতিবাচক সংকেতই সে দেবে, আমাকে। কিংবা হয়ত উল্টোটাই। ঠিক জানি না।

এবারে বুঝতে পারছি, যৌনতার পরিমন্ডল সত্যিই বড় ছোট। দুটো সম্পর্ককে সেখানে বেঁধে রাখা যায় না। তবু আমি হাল ছাড়তে রাজি নই। ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শেষ লড়াইটা করবই। আমি শেষ চেষ্টায় বিশ্বাসী।

ইনসাইড পকেট থেকে কড়কড়ে দেড় হাজার টাকার নোট বের করলাম। ডানহাতের মুঠোয় ধরে, একটা অর্থপূর্ণ ঝাঁকুনি দিলাম। চোখের ভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ঠোটের কাঁপুনিটুকুকেই প্রশ্রয় দিলাম। "সবটা"। চোখের মণিদুটো আমার দ্রুত ওঠানামা করছে। একবার টাকার তোড়াটা, আর একবার মেয়েটার মুখ। মেয়েটাও তাকিয়ে আছে। আমার হাতের কড়কড়ে নোটগুলো, পুরো দেড় হাজার। আমার চোখের মণি। লুব্ধ গরম নিঃশ্বাস।

খিলখিল করে বেশ উঁচু গলায় হাসছে মেয়েটা। আমি শুনতে পাচ্ছি। তার প্রথম সবাক আত্মপ্রকাশ। আমি তাকিয়ে আছি। একটা জোরালো আলো আমার জ্বলজ্বলে চোখ দুটোকে চমকে দিল। গাড়ি ব্যান্ডেলে ঢুকছে। আমি চেয়ে আছি ফ্যাল ফ্যাল করে। মেয়েটার মুখের দিকে। মেয়েটার চোখের দিকে। কোনও ইচ্ছা, কোনও স্বপ্ন, কোনও প্রশ্ন ছাড়াই।

সাগরিকা

অনেকটা স্বভাববিরুদ্ধভাবেই লোকটাকে গালাগাল দিয়ে ফেলল সমরেশ।

যদিও ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, তবে আজকালকার ছেলে ছোকরাদের চালচলন দেখলেই সমরেশের রাগ হয়ে যায়।

সবেমাত্র ট্রেন থেকে নেমেছে। ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা নেই। তারই মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ছেলেটা। কিছু বোঝার আগেই বেশ জোরের সঙ্গেই একটা ধাক্কা খেল সমরেশ। ছেলেটা কোনও রকম ভ্রুক্ষেপ না করেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। ধৈর্য বলতে কিছু নেই। বিরক্তিতে সমরেশের মুখটা কুঁচকে ওঠে। একটু পরেই জামার হাতার দিকে দৃষ্টি চলে গেল। গাঢ় বাদামী ছোপটা সহজে চোখ এড়াবার নয়। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা ছেলেটার হাতের চায়ের ভাঁড়টা ধাক্কাধাক্কিতেই উল্টে পড়েছে সমরেশের ধোপদুরস্ত জামার হাতায়।

বেডিংটা রিক্সায় চাপিয়ে বেশ কিছুটা এগোতেই জোলো হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল সমরেশের মুখে চোখে। গাছের ফাঁক দিয়ে নোনা জলের নীল রেখা দেখা যাচ্ছে। স্টেশনে ঐ ছোকরার কীর্তিকলাপে মনটা দমে ছিল সমরেশের। কিন্তু সমুদ্রের সান্নিধ্যে এসে সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। রিক্সাচালক প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে বাংলা আর উড়িয়া মিশিয়ে সস্তায় আরামে থাকার নানা লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করছিল। সমরেশ সেদিকে কান না দিয়ে, এ গাছের সে গাছের ফাঁক দিয়ে যতটা জলের রেখা দেখা যায়, তাই-ই দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

এর আগেও আরও দু'তিনবার পুরীতে আসার পরিকল্পনা করেছিল সমরেশ। কিন্তু ঘটনাচক্রে আর আসা হয়নি। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর প্রায় বছর পাঁচেক কেটে গেল। এবারে সমরেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পেনসনের টাকা হাতে পেয়েই কয়লাঘাটা থেকে অগ্রিম টিকিট কাটা। বিপত্নীক সমরেশের সংসারের কোনও পিছুটান নেই। সুতরাং বেরিয়ে পড়।

কোল ইন্ডিয়ার হলিডে হোমটা মোটামুটি ভালই। তবে সমুদ্র থেকে কিছুটা দূরে। সমরেশ অবশ্য জানে, বেশীরভাগ হলিডে হোমগুলোই সমুদ্র থেকে কিছুটা দূরেই হয়। তবু মন্দ কী।

দুপুরে একটা ভাত ঘুম দিয়ে বিকেল নাগাদ সাদা ধুতির উপর খদ্দরের পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে নিল সমরেশ। এবারে একটু সি-বিচ্ থেকে ঘুরে আসা যাক। বেতের লাঠিটাও সঙ্গে নিল। বয়স যেন বড় বেশী করে চেপে বসেছে সমরেশ মুখাৰ্জ্জীর পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা শরীরটার উপর। এ বয়েসেও কত মানুষ বেশ ছটফটে থাকে। ঐ তো গাঙ্গুলী দা'। সমরেশের চেয়েও বছর তিনেকের বড়। এখনও দিব্যি ভিড় বাসে ঝুলতে ঝুলতে বেহালায় যান, মেয়ের বাড়িতে। অথচ সমরেশের পয়ষট্টি বছরের শরীরটা যেন একটু বেশিই দুর্বল হয়ে পড়েছে। হার্টের রোগও কিছুদিন আগে ধরা পড়েছে। তাই এখন সাবধানে থাকতে হয়। লাঠি ছাড়া যে চলতে পারে না, তা নয়। তবে একটা লাঠি থাকলে বেশ সুবিধা হয়। বেশ পয়সা খরচ করেই তৈরি করিয়েছে লাঠিটা। হাতের কাছটায় একটু বাঁকা। ওখানটা রূপা দিয়ে বাঁধানো।

সূর্যাস্ত হচ্ছে। বেলাভূমিতে সমরেশের মতই বেড়াতে আসা মানুষের ভিড়। অধিকাংশই বাঙালি, তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতে ক্যামেরা। বিচ্ জুড়ে ফ্ল্যাশের ঝলসানি। দু'একজন মোবাইলেও ছবি তুলছে। জলের বেশ কিছুটা অংশ কালচে-লাল হয়ে গেছে। যেন কোনও তাজা মানুষের গা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরনো রক্ত। ছড়িয়ে পড়ছে একটু একটু করে। বেশ জোরে হাওয়া দিচ্ছে। পরিপাটি করে আঁচড়ে রাখা সমরেশের কাঁচা পাকা চুলগুলো সব এলোমেলো হয়ে গেল। তবু বেশ ভাল লাগছে। একটা ঠান্ডা সতেজ ভাব দেহের প্রতিটি সন্ধিতে এক তীক্ষ্ণ সুখের পরশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। ডানহাতের মুঠো দিয়ে লাঠিটা এটু বালির মধ্যে গেঁথে দিল। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আরও অনেকেই সূর্যাস্ত দেখছে। বেশ কয়েক জোড়া কপোত-কপোতীও চোখে পড়ল। দু'এক জোড়া আবার এমন ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে আছে যে, দেখলেই হাসি পেয়ে যায়।

'দূর ছাই! যত নষ্টের গোড়া ঐ মেঘটা।'

দলছুট একফোঁটা বুনো মেঘ শেষ মুহূর্তে সূর্যটাকে ঢেকে ফেলল। চাপ দাড়ি, বেঁটে-খাটো, বেশ স্মার্ট গোছের এক ছোকরা গলায় একটা দামি ক্যামেরা ঝুলিয়ে, সামনে দিয়ে হনহন করে চলে গেল। মুখে তার একরাশ বিরক্তি। 'হোপলেস! রোজই এক শট।' বিড়বিড় করে বলতে বলতে চলে গেল সে। বেচারা অন্তিম মুহূর্তটুকুর ছবিটা ক'দিন ধরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়েও তুলতে পারছে না। ভেবেই সমরেশ হেসে ফেলল।

বেশ ভোরেই উঠল আজ সমরেশ। রাতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল ঘড়িতে। খুব ভোরে ওঠা সমরেশের চিরকালের অভ্যাস। অ্যালার্ম ঘড়িটা তাই নিয়ে আসতে ভোলেনি। কাল রাতে হঠাৎ মেঘ করে, ভালমত বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশটা এখনও ভারি হয়ে আছে। কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। দৃষ্টি বেশি দূর যাচ্ছে না। অবস্থা দেখে সমরেশ পাঞ্জাবির উপর মানালী থেকে কেনা পশমের শালটা বেশ করে জড়িয়ে নিল। সমুদ্রের কাছটায় এখন বেশ ঝোড়ো হাওয়া বইছে। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। বেতের লাঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে ঘন কুয়াশা। মোটা ফ্রেমের চশমার কাঁচটা থেকে থেকেই ঝাপসা হয়ে আসছে। সমুদ্রের ধারে এসে ঠান্ডাটা টের পেল। ঝোড়ো হাওয়াটা সারা শরীরে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। শালটা বুক জড়িয়ে তবু কিছুটা লাভ হয়েছে। চারদিক ঘন অন্ধকার। আজও সূর্য দেরিতে উঠবে। তবে জমাট মেঘের কালো আস্তরণ পেরিয়ে, আজ আর সূর্যোদয় দেখা যাবে না।

সী বিচে আর কেউ এসেছে কিনা, বুঝতে পারল না সমরেশ। বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। দু'চার জন নুলিয়া অবশ্য এসে গেছে এরই মধ্যে। তাদের নৌকা ছাড়ার মুখে। ওরা কোনও দিনই প্রকৃতিকে পরোয়া করে না। পরোয়া করলে তো চলবে না। সমরেশ ভিজে বালির উপর হাঁটতে শুরু করল। এরকম পরিবেশে মর্নিংওয়াক করতে গিয়ে কেন যেন নেশা ধরে যায়। ক্লান্তি আসতে চায় না। মনে হয়, অখন্ড সময় ধরে শুধুই এগিয়ে চলা। আর কিছু নয়।

হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল সমরেশ। কুয়াশ ভেদ করে কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এবারে অনেকটা কাছে চলে এসেছে। ঝোড়ো হাওয়ায় আকাশি রঙের শাড়িটা থরথর করে কাঁপছে। আঁচলটাও সব শাসনের গন্ডী ভেঙে স্থানচ্যুত হবার প্রবল বাসনায় উন্মুখ। মাথাটা পেছনে ঘুরিয়ে মাঝে মাঝেই ডান হাতে সেটাকে সামলে নিচ্ছে। কৌতূহল জাগানো শরীরটা আরও কিছুটা এগিয়ে আসতে, তার মুখটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সমরেশ। 'সাগরিকা'। ঝোড়ো হাওয়ার মাতলামিতে কপালের উপরের চুলগুলো উড়ে এসে গালের উপর পড়ছে। এক লহমায় ছিমছাম ফর্সা মুখটাকে ঢেকে ফেলছে; আবার উড়ে যাচ্ছে। সাগরিকা, আজ থেকে পয়ত্রিশ বছর আগের সাগরিকা। তবু বদলায়নি এতটুকু। সাগরিকা হেঁটে আসছে সমরেশের দিকেই। সমরেশের মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হল না। পাথরের মত স্থবির হয়ে সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সাগরিকার দিকে। তার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে সাগরিকা। সমরেশকে পাশ কাটিয়ে সে চলে গেল। যেন সমরেশকে চিনতেই পারে নি। সমরেশের চশমার কাঁচদুটো আবার ঘোলাটে হয়ে গেছে। ঘন কুয়াশায় আবার হারিয়ে গেছে সাগরিকা।

'সাগরি!' অনেক কষ্টে ঠোঁট কেটে শব্দটা সমরেশের মুখ থেকে বের হল। খুব মৃদু, কেউ শুনতে পেল না। কুয়াশার ভেতর থেকে কেউ সাড়াও দিল না।

(২)

মাধবীর-ই কী এক দূর সম্পর্কের বোন ছিল এই সাগরিকা। পুরুলিয়ার গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। মাঝারি গড়ন, গায়ের রঙ ঝকঝকে। একটা শান্ত সুকোমল পবিত্রতার ছাপ সারা মুখটাতে ছেয়ে থাকত। নাকটা যেন ছোট্ট একটা বাঁশি। কথা বলার সময় আবার নাকের ডগা অল্প অল্প কাঁপত, তিরতির করে। চোখদুটো বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। সব সময় এমন টান টান করে চুল আঁচড়ে রাখত; মনে হত এইমাত্র বুঝি স্নান করে উঠে এল। তবে কথাবার্তায় সব সময়ই একটা বেপরোয়া ভাব, যা তার চেহারার সঙ্গেই একেবারেই বেমানান। এই বৈপরীত্যটাই সমরেশকে বড় টানত। এক অদ্ভুত মোহে, এক অমোঘ আকর্ষণে। সেই টানে সমরেশ নোঙর ছিঁড়ে ভেসে গিয়েছিল।

একেবারে প্রথম দিনই সমরেশকে অপ্রস্তুতে ফেলে দিয়েছিল সাগরিকা। সুটকেশপত্র নিয়ে রিক্সা থেকে নেমে সবেমাত্র ঘরে ঢুকেছে। সমরেশের তখন অফিস যাবার তাড়া। হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সমরেশ। সাগরিকা দু'হাত দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল।

'এ্যাই যে মশাই, আপনি তো আচ্ছা মানুষ। আমি আসতেই পালিয়ে যাবার ধান্দা। আমি কি এতই খারাপ?'

সমরেশকে জবাব দেবার সময় দিল না সাগরিকা।

'বলেন তো, এখনই চলে যাই। আর আসব না।'

এর পরে আর কথা চলে না। হেসে ফেলল সমরেশ। সেদিন আর অফিসে যাওয়া হল না।

অনেকখানি উষ্ণতা নিয়ে হাজির হল সাগরিকা। সমরেশও বড় তাড়াতাড়ি সেই নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। অফিস ফেরতা সমরেশ সোজা চলে যেত ময়দানে। আর দশটা বাঙালি প্রেমিকের মত। দেখতে পেত, আশেপাশে আরও বেশ কিছু চকচকে মুখ। গোপন প্রেমের ওমধরা উষ্ণতায় লাল হয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠত। ঘাড়ের কাছে একটা ছোট্ট চিমটি খেয়ে সম্বিৎ ফিরে আসত তার।

'কি দেখছ অমন হাঁ করে?'

মাটি ফুঁড়ে হাজির হত সাগরিকা। সাগরিকার ঝকঝকে মুখটার দিকে তাকিয়ে সমরেশ হেসে ফেলত। বলত, 'পরীদের'। বলে আবার হেসে উঠত শব্দ করে। সাগরিকা নরম নরম আঙুলগুলো দিয়ে সমরেশের ঠোঁট চেপে ধরত।

'আস্তে আস্তে; পরকীয়া প্রেম অমন ঢাক পিটিয়ে করতে নেই। রেখে ঢেকে, চুপিসারে করতে হয়।' বলে সমরেশের বুকে পুটুস্ করে আবার চিমটি কাটত। তারপর ওরা হাঁটা শুরু করত, রবীন্দ্রসদনের দিকে।

'সমরেশ নামটা ভাল। কিন্তু বড্ড সেকেলে। ওটাকে ইমিডিয়েট্ চেঞ্জ করে ফ্যালো।' কিশোরী মেয়ের মত সাগরিকা আবদার করে।

'বলো কী! পিতৃদত্ত নামখানা একেবারে খারিজ!'

'সো হোয়াট?'

'দুস্! তা কখনও হয়। পাগল না... তাছাড়া তোমার নামের সঙ্গে তো বেশ মিল খায়। সমরেশ, সাগরিকা। বেশ তো লাগে।'

'মোলো যা! কোথায় সাগরিকা আর কোথায়...!'

'সকলের-ই কি তোমার মত মিষ্টি নাম হয়?'

'জানো, খুব ভোরে আমার জন্ম হয়েছিল। 'শবনম' নাম হলে বেশ হত। তবে সাগরিকাটাও নেহাত মন্দ নয়, কি বলো?'

এমনই সব কথা হত। হয়ত যার কোনও অর্থ নেই, প্রয়োজন নেই। অনাবশ্যক। তবুও।

সেদিন একপ্রস্থ বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিকেলের ভেজা আলোয় সদ্যস্নাত গাছের পাতাগুলো ঝলমল করছে। সমরেশ আর সাগরিকা হেঁটে চলেছে। সাগরিকার পেলব শরীরটাকে বড় বেশি করে আজ ছুঁতে চাইছে সমরেশ।

'আচ্ছা, ভালবাসা কাকে বলে?' সাগরিকা প্রশ্ন করল।

সমরেশ খানিক ভেবে জবাব দিল, 'ভালবাসা এমন এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন, যার ডাকে একবার সাড়া দিলে আর পেছন ফিরে তাকানো যায় না।'

'হুঁ।'

'তুমি কি বল?'

'আমি?' সাগরিকা ঘাড় ঘুরিয়ে সমরেশের চোখে চোখ রাখল। বলল, 'জীবনটাকে চেটেপুটে খাওয়ার আর এক নাম ভালবাসা।'

প্রথমবার বেশিদিন থাকেনি সাগরিকা। তবে মাঝে মধ্যেই সে চলে আসত স্কুল ছুটি নিয়ে। সপ্তাহখানেক থেকে যেত। ছুটি নিতে হত সমরেশকেও। সাগরিকার-ই পীড়াপীড়িতে। শেষ দিকে অবশ্য আর সাগরিকাকে পীড়াপীড়ি করতে হত না। সমরেশ নিজে থেকেই ছুটি নিত। মাধবীরও একটা সঙ্গিনী জুটে গেল। সারাদিন বাড়িতে একলা বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে সেও যেন হাঁপিয়ে উঠত। এ হেন পরিবেশে সাগরিকার উচ্ছল উপস্থিতি মাধবীর ভেতরও একটা নতুনত্বের ছোঁয়া আনল। যতক্ষণ না স্বার্থে ঘা লাগে, ততক্ষণ মেয়েদের মত মেয়ে প্রেমিক আর কেউ নেই।

(৩)

ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে পরের দিনও খুব ভোরে আধো অন্ধকারে হাজির হল সমরেশ। ঝোড়ো হাওয়ার তেজটা আজ একটু কম। আকাশের মেঘ এখনও কাটেনি। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। অনেকগুলো এলোমেলো চিন্তা দু'হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে সমরেশ এগিয়ে চলল। প্রতিদিনের অভ্যাসমত মর্নিংওয়াক, রূপা বাঁধানো হাতলে হাত রেখে। চশমার কাঁচটা মাঝে মাঝেই ঝাপসা হয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়ে বুকের উপর জড়ানো নরম শালে একেকবার মুছে নিচ্ছে কাঁচটা। তারপর নাকের উপর ঠেলে তুলে আবার এগিয়ে চলা।

বেশ খানিকটা এগোতে চোখে পড়ে গেল। ঐ তো, ঐ যে কুয়াশা ভেঙে কে যেন এগিয়ে আসছে। বেশ দ্রুত পায়ে। বেশ কিছুটা কাছে চলে এসেছে। একজন নয়, দু'জন। একজন সাগরিকা, আরেকজন...। সমরেশের গা ঘেঁসে চলে গেল দু'জন, উল্টোদিকে। মাতাল হাওয়ায় পত্পত্ করে উড়ছিল হলুদ ফ্রকটা। সাগরিকা নিজেও একটা হলুদ শাড়ি পরেছে। তার আঁচলও বেপরোয়া। হলুদ রঙ, সাগরিকার প্রিয় রঙ। ওরা দু'জনেই আজ হলুদে রেঙেছে। সাগরিকা আর তার হাত ধরে চলা ঐ বাচ্চা মেয়েটা। 'কুসুম!' সমরেশের ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপছে।

(৪)

সেদিন সকালে ফোন এল। সমরেশের শ্বশুরবাড়ি থেকে। মাধবীর বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না অনেকদিন ধরেই। পড়িমরি করে উদ্বিগ্ন মাধবী বেরিয়ে গেল একাই। সমরেশ তখন তৈরি হচ্ছে অফিস যাবে বলে। আজ ইউনিয়নের একটা জরুরী মিটিং আছে। অফিসে একটা গন্ডগোল চলছে অনেক দিন ধরে। সেই নিয়ে ইউনিয়নগুলো একটা সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে। দাবি-দাওয়া পূরণের ব্যাপারে একটা ফাইনাল ডিসিশন নেওয়া হবে। দিল্লী থেকেও ইউনিয়নের বড় নেতারা আসছেন। সমরেশ দ্রুত হাতে অফিসের কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। অ্যাটাচির মধ্যে ঝপাঝপ পুরে ফেলে দরজার কাছে এসে সমরেশ থমকে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে সাগরিকা, সেই প্রথম দিনের মত।

'সরো সাগরিকা, আজ একবার যেতেই হবে।'

'না, যেতে দেব না।'

'কিন্তু একটা ইম্পরট্যান্ট...'

'আমার চেয়েও বেশি ইম্পরট্যান্ট?'

'না, তা নয়। তুমি বুঝতে পারছ না।'

'আমি সব বুঝি।'

সমরেশকে আর কিছু বলতে দিল না সাগরিকা। দু'হাত দিয়ে সমরেশকে ঘিরে ধরল। মুহূর্তের উষ্ণ ঘেরাটোপে সমরেশ নিজেকে আবিষ্কার কবল এক সুডৌল নরম আচ্ছন্নতায়। লক্ষ্যচ্যুত হয়ে চুম্বনের স্বাদটা ছড়িয়ে পড়ল সাগরিকার স্তনবৃন্তে। 'সাগরি!' এক প্রচন্ড ভালোলাগায় শিউরে উঠল সমরেশ। সাগরিকা নিজের উষ্ণ ঠোঁটদুটো ক্রমশ চেপে ধরল সমরেশের বড় বড় ঠোঁটদুটোর মাঝে। সমরেশের দেহরস সে শুষে নিল নিঃশেষে। সে আমন্ত্রণ জানাল সমরেশকে। সমরেশও সেই সব লুকানো কুঠুরির দরজা ঠেলে নিভৃতচারী হতে কোনও দ্বিধা করল না। সাগরিকার এত দিনের উপোসী দেহটা মুহূর্তের জন্য ফুঁসে উঠল। সমরেশের চওড়া কাঁধে দাঁত চিপে ফিসফিসিয়ে সে বলে উঠল, 'কুসুম!'

সাগরিকা সমরেশের স্মৃতিটাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল নিজের মধ্যে। ঝুঁকির প্রশ্ন তুলেও সমরেশ তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। সে শুধু বলেছিল, 'নিজের ওপর এতটুকু ভরসা না

থাকলে...।' সমরেশ শেষ চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, 'তবুও একটা...।' সাগরিকা শুধু গভীরভাবে একটা শ্বাস নিয়ে বলেছিল, 'আমি পারব।'

সাগরিকার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তার মেয়েই হবে। আর তার নাম রাখবে 'কুসুম'। সমরেশকে সে দশজনের চোখে খাটো করতে চায়নি। মাধবীকে লাঞ্ছিত করার কোনও সংকীর্ণ বাসনাও তার ছিল না। 'কুসুম'কে সে নিজের পরিচয়ে আনতে চেয়েছিল। যদিও সমরেশ আজও জানে না, তার মেয়েই হয়েছে কিনা। তাহলে ঐ হলদে ফ্রক পড়া বাচ্চা মেয়েটা... ও কি কুসুম?

সেদিনের সেই ঘটনার পর সাগরিকা আর যোগাযোগ রাখেনি। সমরেশ আর মাধবী দু'জনেই বেশ কয়েকটা চিঠি লিখেছিল সাগরিকাকে। একটারও জবাব আসেনি। পুরুলিয়াতেও আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি সমরেশের। কেন যাওয়া হয়নি, এ প্রশ্নের উত্তর সমরেশের আজও জানা নেই। সমরেশ বোঝে, একবার, অন্তত একবার দেখা করা খুবই প্রয়োজন। তবু এক অদৃশ্য শামুকে তার পা কেটে যায়। চলতে পারে না সে। মনে হত, মাধবীর অদৃশ্য ছায়া বুঝি পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মাধবী চলে যাবার পরও তো পারেনি। বিপত্নীক সমরেশ অনেকবার ভেবেছে, আর কী, এখন তো...। তবু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি, যাব যাব করেও।

(৫)

আজ ঘরে ফেরার পালা। দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দিয়েছে। জানলার ধারেই সিট পড়েছে সমরেশের। অজস্র মানুষের ভিড় পুরী স্টেশন জুড়ে। ঠেলাঠেলি করে যার যেদিকে দরকার, সে সেদিকেই যাচ্ছে। কিন্তু... ঐ... ঐ যে সাগরিকা, হলুদ শাড়ি পরে, এদিকেই তো আসছে। খুব দ্রুত নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল সমরেশ। এবার সে ডাকবেই, সাগরিকাকে। কথা বলবে সাগরিকার সঙ্গে। এবার আর কোনও দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়। সে কথা বলবেই। হলুদ শাড়িটা এগিয়ে আসছে। এখানে কুয়াশা নেই। তবু সমরেশের চশমার কাঁচটা কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। হলুদ শাড়িতে মোড়া নারী দেহের অবয়বটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবু হলুদে ছাওয়া মানুষটা কাছাকাছি আসতেই সমরেশ একরকম চেঁচিয়েই ডাকল, 'সা-গ-রি-কা'।

হলুদ শাড়ি চমকে উঠল। জানলার ভেতর সমরেশের উদ্বিগ্ন মুখ। দু'চোখে কিছু একটা ফিরে পাওয়ার উচ্ছ্বাস। অনেকগুলো প্রশ্নের ছটফটানি। হলুদ শাড়ি পরা মেয়েটা এবার জানলার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে ভেতরে উঁকি মারল।

'আপনি আমাকে কিছু বলছেন?'

'তু-তুমি। এখানে! এত দিন পর...!'

'মাপ করবেন। আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

'আ-আমি... তুমি সত্যিই চিনতে পারছ না, সাগরিকা?'

'আশ্চর্য! আপনি আমার মা-কে চেনেন নাকি?'

সমরেশের মাথাটা ঘুরে গেল। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। বুদ্ধিটা ঠিকমত কাজ করছে না। কী রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সব। এও কি সম্ভব!

মেয়েটা একদৃষ্টে সমরেশের দিকে চেয়ে আছে।

সমরেশ মনে মনে বলল, 'শুধু তোমার মা-কেই নয়, তোমার বাবাকেও আমি চিনি। খুব ভালমত চিনি। সে একটা... সে একটা কাপুরুষ।'

এই ঠান্ডাতেও সমরেশের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জড়ো হয়েছে। জানলার ফাঁক দিয়ে আঙুল বের করে সঙ্গের বাচ্চা মেয়েটাকে দেখাল—'কু-কুসুম?'

'এ মা! কুসুম তো আমি। আপনি কে বলুন তো?'

'কুসুম! আমার কুসুম। এ যে অবিকল সাগরিকা।'

সমরেশের এ মুহূর্তে নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হচ্ছে। চিন্তা শক্তিটা কেমন যেন অকেজো হয়ে গেছে। বুদ্ধিগুলো একদম বুড়িয়ে গেছে, ঠিকমত কাজ করছে না। প্রচন্ডভাবে ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। চিৎকাব করে সমরেশের বলতে ইচ্ছা করল, 'আমি... আমি তোর...।' কিন্তু নাঃ, পারল না। কিছুতেই বলতে পারল না। 'আ-আমি একটা কাপুরুষ।' মনে মনে সমরেশ নিজেকেই ধিক্কার জানাল। তবু একেবারে শেষ মুহূর্তে সে বাচ্চা মেয়েটার দিকে কাঁপুনি ধরা আঙুলগুলো বাড়িয়ে দিল। বাচ্চাটা অবাক বিস্ময়ে গোলগোল চোখ করে সমরেশকে দেখছে। তিনজনকেই চমকে দিয়ে গার্ডের হুইসেল বেজে উঠল। ঝাঁকি দিয়ে কামরাটা নড়েচড়ে উঠল! সমরেশ হাতটাকে আরও প্রসারিত করে দিল। একবার ছোঁবে, তার উত্তরাধিকারীণিকে। কিন্তু ফাঁকটা ক্রমশ বাড়তেই থাকল। আরও অনেক কথা ছিল, অনেক কিছু জানার ছিল। সে সব আর...।

কুসুম মিষ্টি হেসে তার মেয়ের চুলে ইলিবিলি কেটে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি সব বলল। বাচ্চাটা এবারে হাত নাড়ছে, একটু একটু করে। কচি কচি ফর্সা হাত দুটো ফুলের মত নরম, সুগন্ধী।

সেই গহন গভীর গন্ধটা কোনও মেঘবালিকার নয়। এ গন্ধ সমরেশের বড় চেনা। সাগরিকার গায়ের গন্ধ।
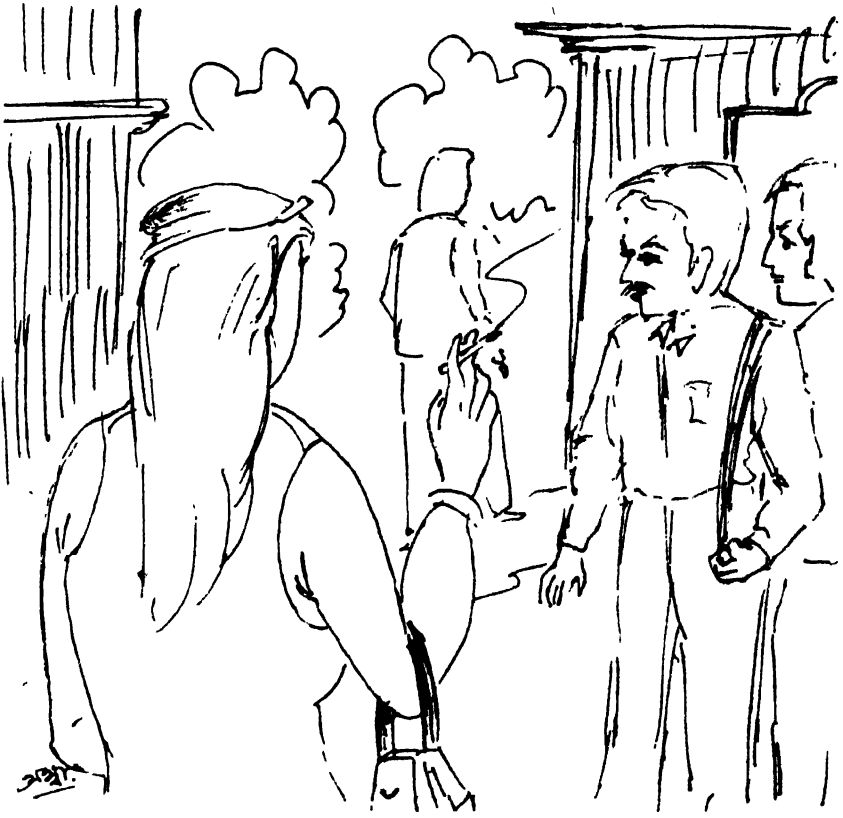
মেঘরঞ্জনী

'খা না। য'টা পারিস, ত'টা খা।'

মেঘা গালটা এগিয়ে দিল। আমরা তো হতবাক্। আচ্ছা বিচ্ছু মেয়ে তো! অজিতটা বলল বলেই গাল বাড়িয়ে দিতে হবে!

'যা যা, ফোট্। খুব দেখলাম। মুখে বাত ছাড়িস। হিম্মত নেই।'

কনুই দিয়ে অজিতের বুকে গুঁতো মেরে মেঘা ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। আমাদের মুখে কোনও কথা নেই। অজিত পুরো বোকা বনে গেল। বি.ডি.-র ক্লাসটা অফ্ যাচ্ছিল। মেঘা প্রফেসরের টেবিলে বসে পা দোলাচ্ছিল। সবুজ স্কার্টের ফাঁক দিয়ে 'ওর ফর্সা পা দুটো বড্ড চোখে লাগছিল। সাধে কি অনুপ প্রথম দিনই বলেছিল, 'মেয়েটার একটু ফুসকুড়ি আছে মাইরি।' স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহারে অনুপের কোনও কার্পণ্য নেই। তা যেভাবেই বলুক না কেন,

ঠিকই বলেছে। দু'দিনেই মেঘাকে চিনে গেছি। 'ওর মত দুঃসাহসী মেয়ে এর আগে কখনও চোখে পড়েনি।

কলেজ শুরুর সপ্তাহ খানেক পরেই আচমকা একদিন শিরোনামে উঠে এল মেঘা। জুলজীর ইন্দ্রটার হ্যান্ডসাম ফিগার। মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। সেদিন বেল পড়ে গেছে। হন হন করে ক্লাসে ঢুকছিল মেঘা। ব্যালকনিতে ইন্দ্র দাঁড়িয়ে। মেঘাকে দেখেই 'সিটি' দিল। চাবুকের মত ঘুরে দাঁড়াল মেঘা। একেবারে ইন্দ্রর মুখোমুখি। আমরা ভাবলাম এই বুঝি ফটাস্ করে চড় মারল; কিন্তু তা হল না। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল মেঘা। ওর টান টান লাল মুখটা স্ট্রংম্যান ইন্দ্রকেও নার্ভাস করে দেয়। হঠাৎ মেঘা এক অদ্ভুত কান্ড করে বসল। চোখদুটো একটু কুঁচকে দুটো আঙুল মুখের মধ্যে পুরে পাল্টা 'সিটি' দিয়ে উঠল। ইন্দ্র তখন কুলকুল করে ঘামছে। কোনও রকমে পাশ কাটিয়ে ল্যাবরেটরি রুমে ঢুকে পড়ল ইন্দ্র। আমরা ক্লাসের দরজার মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি। মেঘার অদ্ভুত কান্ডকারখানা দেখছি। মেঘা এরপর ঘরে ঢুকেই আমাদের গায়ে হেলে পড়ল। হো হো করে সে কী হাসি! আমরা তো অবাক। এদিকে 'ওর হাসি যেন আর থামতেই চায় না। একবার কোনও রকমে হাসি থামিয়ে বলল, "দেখলি কেমন মুরগি করলাম?" বলে আবার হাসিতে ফেটে পড়ল।

এত সব দেখেও নবীনবরণের দিন অজিত আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সবার সামনেই দুম্ করে বলে বসল,—

'এ্যাই মেঘা, তোকে একটা কিস্ খাব।'

যেমনি বলা। তড়াক্ করে টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে এল মেঘা। টান টান ফর্সা গালটা অজিতের ঠোঁটের সামনে এনে বলল, 'খা না, য'টা পারিস, ত'টা খা।'

এই হল মেঘার আইডেন্টিটি কার্ড।

আঠারোটা বছর মেঘা কি করে এসেছে, কে জানে! তবে ওর মত মেয়ে উপোসী থাকবার নয়। বেশী না হলেও, অল্প-স্বল্প চেখেচে নিশ্চয়ই। না হলে, এত ধার হল কি করে? সে যাই হোক, আমাদের ক্লাস থেকে প্রথম যে চিঠিটা ওর কাছ গেল, সেটা প্রদোষের লেখা। প্রদোষের মনটা চিরকালই সবার মাঝে উড়ু উড়ু ; একটু টান পড়লেই, ফস্ করে আলগা হয়ে যায়। 'প্রাণ পাপড়ি মেঘা' দিয়ে শুরু করে 'শুধু তোমারই প্রদোষ' দিয়ে শেষ। চিঠিটা আমি পড়েছিলাম। প্রদোষ লিখেছিল, 'মেঘা, তুমি যৌবনের তীর্থক্ষেত্র।' অনুপের সেই কথাটার মত এটাও অব্যর্থ সত্যি। সবাই স্বীকার করবে, সব তীর্থ ঘুরেও এ তীর্থের ঘাটে একবার ডুব না দিলে, যৌবনটাই বৃথা। যদিও শেষ পর্যন্ত সবাইকেই নাকানি-চোবানি খেতে হত। তবুও এর আকর্ষণ ছিল দুর্বার। যুক্তি, চিন্তা, সব কিছুকে অস্বীকার করে ছুটে যেতাম আমরা। এক ধরণের পোকা আছে, যারা মরবে জেনেও আগুনে ঝাঁপ দেয়। মৃত্যুর উল্লাসে মেতে ওঠে তারা। মেঘার ছিপছিপে ঢেউ তোলা শরীরটা 'বেইমান' জেনেও আঁকড়ে ধরতাম। টিপিক্যাল্ দুষ্টুমিতে ভরা ওর ঝকঝকে চোখ দুটোই ছিল আমাদের 'সুইট্ ড্রিমস্', এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। ভোকাট্টা ঘুড়ির মত গোত্তা খেয়ে জড়িয়ে যেতাম ওর জালে। সব জেনে শুনেই। ধরা পড়া শিকারকে নিয়ে মাকড়সা

যে রকম খেলা করে, মেঘাও সেভাবে আমাদের দু'হাতে নাড়া-চাড়া করত। একটু টিপে-টাপে আদর করে ছুঁড়ে ফেলে দিত। কিন্তু ঐ যে একটা কথা আছে—তুমি নেশা ছাড়লেও, নেশা তোমায় ছাড়বে না। একটা এপিসোড শেষ হলেই, আর একটার ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করতাম আমরা। ভাবলে এখন হাসি পেয়ে যায়।

(২)

কলেজ লাইফ শেষ হলে, যা হয়। আজ প্রায় উনিশ বছর হল মেঘার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। কলেজ ছাড়ার পর প্রথম প্রথম যোগাযোগ রাখতাম। তিন চার বছর পর তাও আর সম্ভব হল না। কে যে কোথায় ছিট্‌কে গেলাম, তা নিজেরাও জানি না। এক এক সময় মনে হয়, এতগুলো বছর মেঘাকে না দেখে আছি কী করে! দশটা আঠাশের ট্রেনে মেঘা আসত। স্টেশনে দাঁড়ালে নেহাৎ অশালীন দেখায়, তাই কলেজের গেটের মুখেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। এক এক জন এক এক পজিসনে। বিভিন্ন পোজে। যেমন দেবাংশু। পার্টির পোস্টার মারা ইঁটের থামটায় পিঠ ঠেকিয়ে ওপর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকত। গালের দু'পাশে এলোমেলো দাড়ি, যেন বাবা পঞ্চানন, ভাবে ঢুলুঢুলু। 'কেয়ারফুলি কেয়ারলেস'। আড়চোখে দেখে নিত, মেঘা আর কত দূরে। কাছাকাছি আসতেই ঠোঁটে ফুটে উঠত সেই স্পেশাল হাসিটা। শ্যামল দাঁত কিড়মিড় করত, 'শালা হাসিটা দ্যাখ, পুরো ইনটেলেকচুয়াল'। এদিকে মেঘাও যথারীতি গেট পেরিয়ে ঢুকেই হাসিতে ভেসে যেত। সারা শরীরে সে হাসির ঢেউ উঠত। যে দিন যার দিকে সে হাসির ঢল নামত, সেদিন সে একেবারে গলে যেত। এতখানিই গলে যেতাম যে, ফের জমে উঠতে চব্বিশ ঘন্টা লেগে যেত। তবু গলে যেতাম, সুযোগ পেলেই। পড়াশোনা তখন লাটে উঠেছে। স্বপনে, জাগরণে শুধুই মেঘা। আর কিছু নয়।

পঙ্কজের মত ঝানু ছেলেকেও যেভাবে মেঘা কব্জা করল, সেটাকে প্লট করে বেশ একটা টান টান ইন্টারেস্টিং টি.ভি. সিরিয়াল হয়ে যেতে পারে। পঙ্কজের সঙ্গে দু'দিন মিশলেই বোঝা যায়, সে যে কাউকেই ফাঁসাতে পারে; কিন্তু কখনই নিজে ফেঁসে যাবার ছেলে নয় সে। একই সঙ্গে লাইব্রেরীতে বই পাল্টানো, বই এর ফাঁকে চিরকুট গুঁজে দেওয়া, ক্যান্টিনে ডবল ডিমের ওমলেট, সর্বোপরি এক সঙ্গে নুন শোতে 'ব্লুলেগুন' দেখেও পঙ্কজ অটল। মেঘা ফেল। কথায় আছে, 'রতনে রতন চেনে...'। এও ঠিক তাই। পঙ্কজ তখন ফার্স্ট ইয়ারের ভালোমানুষ গোছের একটা মেয়েকে খেলাতে ব্যস্ত। মেঘাকে নো পাত্তা। ধীরে ধীরে হারতে বসা মেঘা এবার ব্রাহ্মাস্ত্র ছাড়ল। এরকম ব্রহ্মাস্ত্র শুধু মেঘারই তূণে থাকতে পারে। ফাঁকা ল্যাবরেটরি রুমে ঢুকে নিজের অন্তর্বাসের হুকটা নিজে থেকেই খুলে দিল। ঝট্‌ করে আচ্ছন্ন হয়ে যায় পঙ্কজ। মেঘার রক্তবহ উষ্ণ উপত্যকায় কিছুক্ষণের জন্য ঠোঁটটা ঠেকিয়ে রাখে সে। গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে রঙিন ভালোবাসায় বুঁদ হয়ে।

'আই রিয়েলি লাভ ইউ পঙ্কজ।'

'ইজ ইট ট্রুথ?'

'বিলিভ মি।'

অজিত পুরো ব্যাপারটা দেখে ফেলেছিল। দেখেছিলেন পঙ্কজের বিধাতাও। অলক্ষ্যে হেসেছিলেন।

গাছ থেকে আপেল পড়ার মত পঙ্কজও একদিন মেঘার গা থেকে টুক্ করে খসে পড়ল।

প্রেম-টেমের ব্যাপারে তমালটা চিরদিনই একটু সিরিয়্যাস। একদিন হুট্ করে মেঘার কাঁধ চেপে ধরল।

'ভালোবাসা কাকে বলে, সেটা তুমি জান?'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য মেঘা হক্চকিয়ে যায়। তমালের কথার ভেতর একটা ওজন আছে। চট্ করে ফেলে দেবার নয়।

আমাদের ভুল বিশ্বাস ভাঙতে দেরী হল না। মেঘা কাঁধ ঝাঁকিয়ে তমালের কথাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'সেটা কি তোমার মত একজন অসম্পূর্ণ মানুষের কাছ থেকে জানতে হবে? ইউ আর এ সেক্সলেস পার্সন।'

অপমানে তমালের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। মেঘা আবার ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'ভালোবাসা হল আনন্দ। মনের আনন্দ, শরীরর আনন্দ। সেটা যেভাবে খুশি পেলেই হল। নট মোর দ্যান্ ইট্। দুর্বল মানুষেরাই শুধু কবিতা লিখে প্রেম করে। আই হেট দেম্।'

অনুপ ফিস্ ফিস্ করে ফোড়ন কাটল। 'যাঃ শালা! তমালটাও কেস খেয়ে গেল। সত্যিই মেঘার বেড পার্টনার যে হবে, সে মাইরি ওফঃ! একেবারে...।' আরও বেঁফাস কিছু বলাব আগেই আমরা অনুপকে থামিয়ে দিই। মেঘাব বিরুদ্ধে কোনও কথাই আমাদের সহ্য হয় না। আমরা সবাই ছিলাম তার গোপন প্রেমিক; পুড়ব জেনেও আগুনে ঝাঁপ দিতাম।

(২)

পুরো ব্যাপারটা এখন নতুন করে ভাবতে গেলেই হাসি পেয়ে যায়। পুরনো ছেলেমানুষিগুলো অজ্ঞাতে লজ্জায় ফেলে দেয়। এটাকেই বোধ হয় 'ম্যাচিওরিটি' বলে। সে কথা ভাবলে, মেঘাও তো এখন ম্যাচিওর হয়েছে। ম্যাচিওর বলতে যদি গুরুগম্ভীর, রাশভারি বোঝায়, তাহলে তো... না, না, মেঘা গুরুগম্ভীর? অসম্ভব! লাখ টাকা বাজি।

প্রদীপ বলছিল, 'দ্যাখ্ গে, ঘোর সংসারী হয়ে গেছে। সিঁথিতে এক খাবলা সিঁদুর দিয়ে চারা মাছে হলুদ মাখাচ্ছে। মাঝে মাঝে দুরন্ত ছেলে-মেয়েদের চোখ রাঙাচ্ছে। কে জানে বাবা, ক'টা ছেলেমেয়ে হয়েছে?।'

এটা সত্যিই ভেবে দেখার মত। ছট্ফটে বেপরোয়া মেঘা এখন টিপিক্যাল্ হাউস-ওয়াইফ। দু'তিনটে ছেলেমেয়ে যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তবে তো সে ফিগার আর নেই। একটা হলে ঠিক আছে। তার বেশী হলে শরীর ঠিক রাখা যে কোনও বাঙালি মেয়ের পক্ষেই বেশ কঠিন। তলপেটের কাছে থকথকে চর্বি জমে গেছে। ধবধবে ফর্সা নাভিটাও গ্ল্যামার হারিয়ে ফেলেছে। ভাবতে গেলেই গা গুলিয়ে যাচ্ছে। এ রকম মেঘাকে দেখতে আমি প্রস্তুত নই। বয়স চলে গেছে বটে, লোভটা তো আর যায় নি।

চন্দননগরে একটা বাড়ি ভাড়া করে মেঘা আছে। অজিতই একদিন খবরটা আনল। মেঘার ভাইয়ের সঙ্গে ওর একদিন দেখা হয়েছিল, ব্যারাকপুর স্টেশনে। তাড়াহুড়োর মধ্যেও অজিত জানতে পারে, মেঘা এখন চন্দননগরে। ঠিকানাটাও মোটামুটি জেনে নেয়। ঐ ভিড়েতে আর বেশি কিছু জানতে পারে নি। অজিত অবশ্য চন্দননগরে যায় নি। কিন্তু আমি যাচ্ছি। ঠিক ছিল দু'জনে একসঙ্গে যাব। কিন্তু পুরনো রেষারেষিটা আর একবার জেগে উঠল। তাই একাই বেরিয়ে পড়লাম। এত বছর পর মেঘাকে আবার দেখব। অনিমেষের সঙ্গেও আলাপ করে আসব।

কলেজ ছাড়ার বছর পাঁচেক পর মেঘা বিয়ে করল অনিমেষকে। অনিমেষ কে, কোথায় থাকে, কিছুই জানতাম না। কি করে মেঘার সঙ্গে আলাপ হল, কতদিনকার ভালবাসা, কিছুই জানতে পারিনি। অনুপই হঠাৎ একদিন বলে বসল—'পাখি ধরা পড়েছে।'

আমি চমকে উঠি।

'ভাগ্যবানটা কে?'

'অনিমেষ'।

'সে আবার কে?'

' কে জানে গুরু, কোথাকার মাল। তবে মালের ক্ষ্যামতা আছে। খাঁচায় তো পুরলো।'

'তুই জানলি কি করে?'

'দেবাংশুকে চিঠি লিখে জানিয়েছে।'

'আর কি লিখেছে?'

'গুলি মার, অত খোঁজের কি দরকার। ধরা যে পড়েছে, এটাই মোদ্দা কথা।'

'তবু আর কিছু জিজ্ঞাসা করলি না?'

'তোর দেখছি এখনও রস যায় নি? রমাকে বলব নাকি?'

আমি তাড়াতাড়ি অনুপকে থামিয়ে দিই। 'থাক্, থাক্, তোকে আর কিছু বলতে হবে না।'

মুখে অবশ্য বলছি, অনিমেষের সঙ্গে আলাপটা করব। তবে অনিমেষ বাড়িতে না থাকলেই সব চেয়ে খুশি হব। এত দিন পর মেঘার সঙ্গে একলা বসে গল্প করব। ও সব অনিমেষ-টনিমেষ থাকলে জ্বালা বাড়বে।

(৪)

প্রদীপ যা বলছিল, তা হলে কিন্তু ভেঙে পড়ব। মেঘাকে নিয়ে মানস প্রেক্ষাগৃহে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছায়াছবি দেখে ফেললাম। মেঘাদের বাড়ির দরজার কড়া নাড়তেই একটা বাচ্চা মেয়ে প্লাস্টিকের খেলনা হাতে বেরিয়ে এল। ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। ওদিকে ভেতর থেকে গলা শোনা গেল। 'কে রে টুকাই?'

'বলো গিয়ে একটা কাকু এসেছে।'

'কোন কাকু, জানিস না? কাগজ দেয় যে?'

মেঘা হেলতে-দুলতে বেরিয়ে এল। পাড়ার দোকান থেকে কেনা প্রায় ন্যাতা হয়ে যাওয়া

একটা ছাপা শাড়ি পড়েছে। পেটে চর্বি জমেছে। কোমরটা ভারি হয়ে গেছে। ন্যাতানো কাপড়ে হলুদের দাগ। শাড়িটা গায়ের সঙ্গে এলোমেলো ভাবে ল্যাপটানো। ঘেমে নেয়ে অস্থির। আঁচল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছতে মুছতে মেঘা এগিয়ে এল। চোখাচুখি হতেই, ''আরেঃ! তুই? কি ব্যাপার? কোথা থেকে?'

'এই তোর কাছেই এলাম।'

'এত বছর পর? কোথায় ছিলি রে অ্যাদ্দিন?' বলেই দাঁত বের করে হেসে ফেলল। আমিও হাসলাম। কিন্তু ভাল লাগল না। মেঘার হাসিটাও কেমন বুড়িয়ে গেছে। বিচ্ছিরিভাবে দাঁত বের করে হাসল। ওর সেই ধারাল হাসিটা কোথায় গেল? ঠোঁটের কোণে সেই তিবতিরে হাসি। এখনকার মত দাঁত বের করা থ্যাবড়ানো হাসি নয়।

'আয় বোস্। তোর খবর কি বল?' আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ধীরে ধীরে সোফায় বসে পড়ল। ওদিকে পর্দার ফাঁক দিয়ে আরও দু'টো কচি মুখ উঁকি মারছে। মেঘার চোখে মুখে অবসাদের ছায়া। অনেকক্ষণ খাটাখাটি করে শরীরটা যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। একটু বসতে পেরে পিঠ এলিয়ে দিল। বিশ্রী লাগছে দেখতে। ওর এরকম হেলেদুলে থেবড়ে বসা দেখে মনটা বেশ কিছু বছর পিছিয়ে গেল।

সে দিন টানা দু'ঘন্টা রোদে ঘোরার পর প্রদীপদের বাড়িতে ঢুকেই হুকুম দিল—

'ওফঃ, চট করে ঠান্ডা নিয়ে আয়।'

ফ্রিজে সরবৎ তৈরিই ছিল। গ্লাসে ঢেলে প্রদীপ চটপট্ নিয়ে এল। মেঘা নিজেই ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে সোফার ওপর শরীরটা ছুঁড়ে দিল। এত্তটা পরিশ্রমের পরও কিরকম প্রাণবন্ত। প্রদীপের হাত থেকে সরবতের গ্লাসটা নিয়ে শব্দ করে একটা চুমুক দিল। 'আঃ!' ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে প্রদীপকে কাছে টেনে নিল। 'আ নাইস গাই'। মেঘার গোলাপি ঠোঁটটা প্রদীপের গাল ছুঁয়ে গেল। মেঘার বাঁ হাতে ধরা ঠান্ডা গ্লাসটা প্রদীপের কানের কাছে। একদিকে চরম উষ্ণতা, অন্যদিকে বরফ ঠান্ডা। প্রদীপকে মাতাল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

সবার সামনেই প্রদীপ বলে বসল, 'আই লাভ ইউ, মেঘা।'

'উ-উ-ম্। ফলোয়িং লাভ উইথ মি।' বাচ্চা মেয়ের মত আবার শরীরটাকে সোফায় ছুঁড়ে দিল। সেই হাসি, সেই উচ্ছলতা, সেই কথা। শরীরের বার্তা। অথচ আজ! এই মুহূর্তে আমার মাথার মধ্যে সব কিছু উল্টো-পাল্টা হয়ে যাচ্ছে। টেবিলের উপরে রাখা কাঁচের গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কিন্তু কাঁচ ভাঙার শব্দের বদলে যেন হাততালির শব্দ শুনতে পেলাম। এই মাত্র মেঘাকে নিয়ে আমার মনের প্রেক্ষাগৃহে সেই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের পর্দা উঠে গেল।

(৫)

নাঃ! এরকম হতেই পারে না। এ জন্য আমি মেঘার কাছে যাচ্ছি না। মেঘার কাছে এত বছর পর যাচ্ছি, ওকে এভাবে দেখব বলে নয়। ওকে অন্যভাবে দেখতে চাই, অন্যভাবে পেতে চাই সেই আগের মত করে। উচ্ছল, প্রাণবন্ত, দুর্বিনীত। চন্দননগর স্টেশনে নেমে একটা রিক্সায় উঠেছি। রিক্সাওয়ালাকে ঠিকানা দিয়েছি। বলল, চেনে। মানুষ যা চায়, তা বেশিরভাগ সময়ই

পায় না। অন্তত আমি তো পাইনি কোনওদিন। চেয়েছিলাম বি.এ. তে ফিফ্‌টি পারসেন্ট। হল না। যার জন্য হল না, চাইলাম তাকে, মেঘাকে। তাতেও ফেল। রিক্সায় চেপে সবকিছু ভাবতে ভাবতে একেবারে ঘেমে উঠলাম। মেঘার সঙ্গে কি ভাবে আবার চোখাচুখি হবে, কি কি কথা হবে, সবই ইতিমধ্যে মনে মনে ভেবে ফেলেছি। মানসচক্ষে মেঘার স্থূলতা দেখে শিউরে উঠেছি। ভেবে ভেবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। এক এক সময় মনে হচ্ছে, রিক্সা থেকে নেমে যাই। ফিরে যাই স্টেশনে। কিন্তু মুখ ফস্‌কে অন্য কথা বেরিয়ে গেল—'ভাই একটু জোরে। তাড়াতাড়ি।' বুঝতে পারলাম চাপটা আমি আর ধরে রাখতে পারছি না।

'বাবু এটাই।' ঘোরের মধ্যে ছিলাম, খেয়াল করিনি, রিক্সা থেমে গেছে। রিক্সাওয়ালাটা এবার একটু গলা উঁচিয়ে ডাকল।

'বাবু, এইটেই তো।'

'ওঃ! হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটাই।'

মানিব্যাগ থেকে খুচরো বার করে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। কুড়ি টাকার একটা নোট হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলাম। 'কিছু মিষ্টি নেব নাকি?' কিন্তু কিরকম যেন বাধো বাধো ঠেকল। তার চেয়ে বরং গোলাপের তোড়া... ধুস্‌, যত বাজে চিন্তা। অনুপটা ঠিকই বলেছে। এ বয়সেও রস যায় নি আমার।

দেওয়ালের গায়ে যে নম্বরটা লেখা আছে, সেটা আমার হাতে ধরে রাখা কাগজটায় লেখা নম্বরটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। একতলায় বাড়িওয়ালা, আর দোতলায় ভাড়া থাকে মেঘারা। নিজেকেই অবাক করে দিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। বন্ধ দরজার এক কোণে ঘন্টার ছবি আঁকা সুইচটা। সুইচে হাত রেখেও থমকে দাঁড়ালাম। আর একটু চাপ দিলেই, কেউ এসে দরজাটা খুলে দেবে। তারপর...। সব চিন্তা-ভাবনাগুলো মুহূর্তের জন্য জট পাকিয়ে গেল। কলেজ লাইফে মেঘাকে কখনও 'তুই' বলতাম। কখনও 'তুমি'। অবস্থা বুঝে, সময় বুঝে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে 'তুমি' বলাই ভাল। এত বছর পর 'তুই' টা...। ভাবতে ভাবতে অজান্তেই সুইচে চাপ দিয়ে ফেললাম। টিং টং শব্দে নিজেই চমকে উঠলাম। আওয়াজটা যেন বুকের ভেতর আছড়ে পড়ল। আমি একধাপ নেমে এলাম। মনে হচ্ছে, আওয়াজটাকে এক্ষুনি ফিরিয়ে আনি। মেঘার কানে পৌঁছাবার আগেই ফিরে যাই স্টেশনে। দৌড়ে। কিন্তু ভারি পা দুটোকে কিছুতেই আর সরাতে পারলাম না। এরই নাম বোধহয় মোহ, নেশা। মেঘার নেশা। ইতিমধ্যে কতটা সময় চলে গেছে খেয়াল করিনি। দ্বিতীয়বার চমকে উঠলাম, দেখি সামনের সবুজ পাল্লা দুটো খুলে যাচ্ছে। কে আছে ঐ সবুজ পাল্লার পিছনে? কোনও শিশু সন্তান নাকি মেঘা নিজেই? সেই আগের মত সবুজ, সতেজ, ফুরফুরে...। না, না, বাস্তবটাই মেনে নাও ভায়া; থলথলে, ভারিক্কি ..।

দরজা খুলে যে বেরিয়ে এল, তার গায়ের রঙটা বেশ ময়লা। চোখ দুটো একটু ভেতর দিকে ঢোকা। বেঁটে খাটো চেহারা। বছর কুড়ি বয়স।

'কাকে চাই?' গলার স্বরটা বয়সের তুলনায় একটু ভারি।

'অ্যাঁ! হ্যাঁ, মেঘা। মেঘা...' মেঘার পদবীটা বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। মেঘার পরিবর্তিত পদবীটা কি, তা জানি না। অনুপ বলেনি আমাকে।

'বৌদিমণি, একজন এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন।'

'নাম জিজ্ঞাসা কর।'

মেঘার গলাটা ভালো করে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ঠিকমত কাজ করছে না। নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

'আপনার নামটা?'

চমকে উঠে নামটা বললাম।

'নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। কই দেখি বাবুটিকে।' একটা উচ্ছ্বসিত গলার স্বর বিলিতি পারফিউমের মত সারা ঘরে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল।

'আরে! ডারলিং তুমি? মাই ফরচুন!'

একটা ইজি চেয়ারে শরীরটা হেলে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই সামান্য সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

'মাই লাভ, মাই ফরচুন। বোস্ বোস্, কেমন আছিস?'

ঘাড়টা একটু ডানদিকে হেলিয়ে মেঘা কি যেন খুঁজতে লাগল।

'আরে তোর বউ কোথায়? তাকে ফেলে এলি নাকি? মাস্ট বি আ সুইট গার্ল, আই ইমাজিন।'

মেঘা বসে আছে চেয়ারে। ছিপছিপে ঢেউ তোলা জাদুকরী শরীরটা এখনও তরতাজা। চোখের তারায় সেই নেশা, সেই মাদকতা। সারা শরীরে এক ফোঁটা মেদ জমেনি। ক্যালেন্ডারে বয়স বেড়েছে, শরীরে নয়। বরং একটু ঘষা-মাজা হয়ে গেছে। আরও চক্চক্ করছে।

মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, 'তুই এখনও সেরকমই...!'

'সার্টেন্‌লি। হোয়াই নট?'

'আমি ভাবলাম বিয়ে, বাচ্চা...।'

'বাচ্চা? দ্যাট্ ন্যাস্টি চিলড্রেন?' আই হেট দেম্।'

'মানে?' আমি হকচকিয়ে গেলাম।

'ওসব বাচ্চা-টাচ্চা কোনও কালেই আমার ধাতে সয় না। কাঁথা, বমি, হিসি, ট্যাঁ ট্যাঁ... ওফ্! অল বোগাস! যে ক'দিন আছি, লাইফটা এনজয় করে যাব।'

'ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি।' আমি বললাম।

'অফকোর্স! লাভ অ্যান্ড সেক্স আর মাই প্রাইড্। যাক্‌গে, কি খাবি বল? ঠান্ডা না গরম? ওকে, বাসন্তী, একটা কোল্ড ড্রিংকস্ নিয়ে আয়।'

আমি ক্রমশ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। মেঘার মধ্যে আজও সেই ছট্‌ফটানি, উচ্ছলতা, বেপরোয়া ভাব। প্রশ্ন করে উত্তর শোনার ধৈর্য নেই। আগের মত টগবগে ছেলেমানুষি। আমি মনে মনে অবশ্য এটাই চেয়েছিলাম। তবু...।

'তোর খবর কি বল? কি করছিস এখন? কাকে বিয়ে করলি?'

একগাদা ছটফটে প্রশ্ন আমার দিকে ছুটে এল। এক এক করে সব জবাব দিলাম। রমার কথাও বললাম।

'সম্বন্ধ করে বিয়ে করেছিস! সত্যি-ই তুই একটা গরু।'

এমন তীব্র রসিকতা এ বয়সে আমার পক্ষে হজম করা বেশ কষ্টকর। 'কিন্তু আমি এলাম তোর কাছে; তোর খবর জানতে।'

জানি না 'তুমি' ছেড়ে কখন আরও কাছাকাছি 'তুই' তে চলে এসেছি। মেঘা সেই আগের মত উচ্ছল ভঙ্গিতে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল। মাথার চুলগুলো সব হেলে-দুলে উঠল। ঝক্‌ঝকে হাসিতে লুটোপুটি খেয়ে, আমাকেও মনে মনে লাট খাইয়ে, জবাব দিল, 'খবর আর কী? বেশ ভাল আছি। এনটায়্যার চারমিং। মাঝে মাঝে অবশ্য একটু নিঃসঙ্গ লাগে। তোদের অভাবটা অনুভব করি; তা সে বয়স বাড়লে সবারই একটু আধটু হয়। কি বলিস? তোর হয় না?'

'হয় বৈকি।'

যে কথাটা চেপে গেলাম সেটা হল, আর কারও জন্য না হলেও, মেঘার জন্য হয়। বেশ ভালোমতই ওর অভাবটা অনুভব করি, যদি আরেকবার ফিরে যাওয়া যেত ঐ জোনাক জ্বলা দিনগুলোতে। যদি...।

'যাক্ গে, তোর বর কোথায়?'

'কে?'

'অনিমেষ?'

নাকটা কুঁচকে দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল মেঘা। চক্‌চকে লালমুখে বিরক্তিকর মেঘ। 'ড্যাম ইট। ওর সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই।'

'মানে! তুই তো...।'

'ডিভোর্স করেছি।'

'বাট হোয়াই?' আমি চমকে উঠলাম।

'পোষায়নি তাই। ওর মত একটা ছোটলোককে নিয়ে ঘর করা... অ্যাবসার্ড। বুড়ো শকুন।'

'কিন্তু...।'

'ও একটা স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, জোচ্চর। সান অফ্ এ বীচ্। আ উইক্ পার্সন। আমাকে সুখ দিতে পারে নি। তুই তো জানিস, আমার মনের সুখ, আমার শরীরের সুখকে আমি ভীষণ ভালবাসি। অনিকে বিশ্বাস করেছিলাম। বাট্ হি ফেইলড্।'

একটু থমকে দাঁড়াল মেঘা। গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল,—'তা ছাড়া ও আমার কাছে পুরনো হয়ে গিয়েছিল।'

মেঘা একবার হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিল।

'তা বলে অনিমেষকে ডিভোর্স...?'

মেঘার চোয়ালটা শক্ত হয়ে গেল। মুখটা ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

'ওর নাম আমার সামনে একবারও উচ্চারণ করবি না। হি ইজ আ পিগ্।'

'আমি শুনেছিলাম, ভেরী আন্ডারস্ট্যান্ডিং, লাভিং।' চট্ করে একটা মিথ্যা কথা বললাম।

মেঘার নাকের পাটা ফুলে উঠল। রাগে লাল মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল। সেই আগের মত ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'সব ব্যাপারেই না জেনে কমেন্ট করা তোদের একটা ব্যাড হ্যাবিট্। তুই ওর সম্বন্ধে কতটুকু জানিস? হি ইজ আ... ওক্কে, লিভ্ ইট।'

মেঘা আর একবার ঘড়ি দেখে নিল। বুঝতে পারলাম, মেঘার একটা তাড়া আছে। কোথাও যাবে কিংবা কেউ আসবে। এই নিয়ে দু'বার ঘড়ি দেখল। কালো বেঁটে মেয়েটা একটা ঠান্ডা পানীয় এনে দিল। সঙ্গে প্লেটে সাজানো কয়েকটা মিষ্টি।

'আবার এসব কেন?'

বলতে বলতে সবকটাই খেয়ে নিলাম। মেঘার দেওয়া মিষ্টি। আর দশটা মিষ্টির চেয়ে একটু বেশিই মিষ্টি লাগার কথা।

আরও মিনিট পাঁচেক এলোমেলো বকলাম। অনিমেষের কথা আর তুললাম না। ফিরে গেলাম সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে। স্মৃতি রোমন্থন বড় মধুর। এ বয়সেও।

আরও কিছুক্ষণ বসার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মন বলল, এবারে ওঠা দরকার। ইতিমধ্যে মেঘা দু'বার ঘড়ি দেখে নিয়েছে। হয়ত কোনও তাড়া আছে। অযথা দেরী করিয়ে দিচ্ছি। উঠে গিয়ে দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

'এরই মধ্যে চললি? আবার আসিস কিন্তু, উইথ ইওর লাভিং রমা।'

'একটু এগিয়ে দিবি না?' হেসে বললাম।

মেঘার হাসিখুশি ফুরফুরে মুখটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল। মাথাটা নামিয়ে নিল। 'সেটা আর সম্ভব নয়।' ডান হাতের মৃদু টোকায় ওর বাঁ পা-টা দেখাল। 'প্যারালাইসিস্। এই জন্যই এই কাজের মেয়েটাকে রেখেছি।'

'প্যারালাইসিস!' মেঘাব কথাটা আমার কানে কেটে কেটে ঢুকে গেল। সত্যিই তো, আমি আসার পর থেকে মেঘা ঐ চেয়ারেই বসে আছে। এই নির্দয় সত্যটা আমার পক্ষে হজম করা অসম্ভব। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। দাঁড়িয়ে থেকে ভেতরে ভেতরে হাঁফিয়ে উঠলাম।

হঠাৎ টিংটং আওয়াজে চমকে উঠলাম। দরজাটা আমিই খুলে দিলাম। দেখলাম, বছর তিরিশের তরতাজা এক যুবক, হ্যান্ডসাম ফিগার। আমার চেয়ে একটু লম্বাই মনে হল।

' কি ব্যাপার? দেরী করলে কেন? হ্যাভ নো পাংচুয়ালিটি।'

মেঘার কথায় ঘুরে তাকালাম। আমার দু'চোখে জিজ্ঞাসা, মেঘা সেটা বুঝতে পারল।

'এ হল অভিজিৎ। আমার পার্টনার।'

আমি শেষবারের মত চমকে উঠলাম। পার্টনার? নিউ পার্টনার। বেড পার্টনার!

টের পেলাম, কুলকুল করে ঘামছি আমি।

'অভি, এ হল আমার ক্লাসমেট, বহু পুরনো দিনের বন্ধু শ্রীমান...' মেঘা আমার পরিচয় দিচ্ছে। সহজাত কৌতুক মিশিয়ে। কিন্তু সে সব কথা আমার কানে ঢুকছে না। আমি ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। ডিভোর্স... প্যারালাইসিস... পার্টনার... বুড়ো শকুন... সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম করে উঠল। অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। পালিয়ে যাব আমি। এখান থেকে এখুনি পালিয়ে যাব। দৌড়ে। স্টেশনে। কেউ দেখার আগেই।

অতঃকিম্

সেদিনের কথা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়!

অথচ প্রথমে দিনটাকে কেন ভালই ঠাওরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত...।

নাঃ। গোটা ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক্।

আর বুঝলেন কিনা, আমি হলুম গিয়ে আর্টিস্ট মানুষ। যদিও আমার গুণের কদর করার মত লোকের যথেষ্ট অভাব আছে। তবু কৌস্তভ রায়ের নাম শুনেছিলাম। ন্যাচাদা বলছিল, 'আর যাই হোক, লোকটা আঁকে ভাল। তবে...।'

তবে আর কী, সেটা আর তখন জানা হয়নি। জানতে পারিনি বলেই আজ আপনাদের এই ঘটনাটা শোনাবার সুযোগ পাচ্ছি। তবে এটা ঘটনা না দুর্ঘটনা, সেটা আপনারাই বিচার করুন। ছেলেবেলায় ডিম আঁকা থেকে শুরু করে আজকের দুর্বোধ্য দাঁড়কাক আঁকা অবধি, একটা

প্রদর্শনী করার সখ আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে। কিন্তু কোনও স্পনসর জোগাড় করা তো দূরের কথা, কেউ কোনওদিন বিন্দুমাত্র তারিফ করেছে বলেও তো মনে পড়ে না।

তবে হ্যাঁ, একজন ছিল—'নিধিরাম'। যদিও লোকে তাকে আড়ালে 'নিধু পাগলা' বলেই ডাকত।

(২)

'ওয়াহো! হোয়াট আ সিনারি!' নিধুর মুখের নাল আমার ছবির উপর পড়ল। নিধুর মতে, ছবিটা আরও খোলতাই হল তাতে।

নিধুর সঙ্গে আমার সেই প্রথম আলাপ। আমার 'উড়ন্ত হাড়িচাঁচা'র ল্যান্ডস্কেপটা দেখে নিধু পাড়ার লোকের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। কি করে? স্রেফ হাড়িচাঁচার ডাক ডেকে।

যা হোক, ঘটিবাটি বেচে নিজের টাকাতেই একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে ফেললাম। আমার যত আত্মীয়, অনাত্মীয়, স্বজন, দুর্জন, চেনা, আধচেনা, সিকি চেনা, এমন কি অচেনাদেরও বলে ফেললাম সে কথা। পান-সুপারি দিয়ে নেমন্তন্ন করে ফেললাম সব্বাইকে। নিধিরাম প্রদর্শনী শুরুর দিন সাতেক আগে থেকেই হাজির। প্রদর্শনী কক্ষের সামনে সে সর্বক্ষণ দণ্ডায়মান ছিল। থেকে থেকেই হাড়িচাঁচার ডাক ডেকে লোক জড়ো করছিল। শেষে এক বিহারি কনস্টেবল এসে তাকে তাড়ায়। আমি কিন্তু তাতে দমবার পাত্র নই। রাতারাতি আরও বেশ কিছু ছবি এঁকে ফেলি। নিধুর প্রস্তাব মত শিল্পী কৌস্তভ রায়কে তড়িঘড়ি চিঠি পাঠিয়ে নেমন্তন্নও করে ফেলি।

(৩)

'এ কি গো! ছবি কই?'

'আজ্ঞে, এটিই ছবি।' (যাক্ কৌস্তভদাকেও অবাক করতে পেরেছি তাহলে)

'বাহ! এক্সসেলেন্ট!'

কৌস্তভদা' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

নিধিরাম বাদে কৌস্তভদা'ই আমার চিত্রকলা প্রদর্শনীর দু'নম্বর দর্শক। অবশ্য আরও একজন উঁকি মেরেছিল। কিন্তু দু'চারটে ছবি চোখে পড়তেই বিলকুল হাওয়া।

যা হোক্, আমি কৌস্তভদা'কে আমার সেরা ছবি 'ঝুলন্ত চেয়ারে উড়ন্ত বেড়াল'-এর সামনে এনে দাঁড় করাই। কৌস্তভদা' টেঁড়িয়ে যান।

'তোমাকে তো ভাই একবার আমাদের বাড়ি আসতেই হচ্ছে।'

'কে, আমি?' অপ্রত্যাশিত আহ্বানে আপ্লুত হয়ে যাই।

'তবে কি আমি?' কৌস্তভদা চোখ পাকান।

ভয়ে ভয়ে দু'বার ঘাড় নাড়ি।

(৪)

'ওয়েলকাম মাই বয়! যাক্ তুমি এসে গেছ তাহলে।'

কৌস্তভদা'র উদাত্ত আহ্বান।

ভোর হতে না হতেই গুটি গুটি পায়ে হাজির হয়েছি কৌস্তভ রায়ের বাড়িতে। কৌস্তভদা'
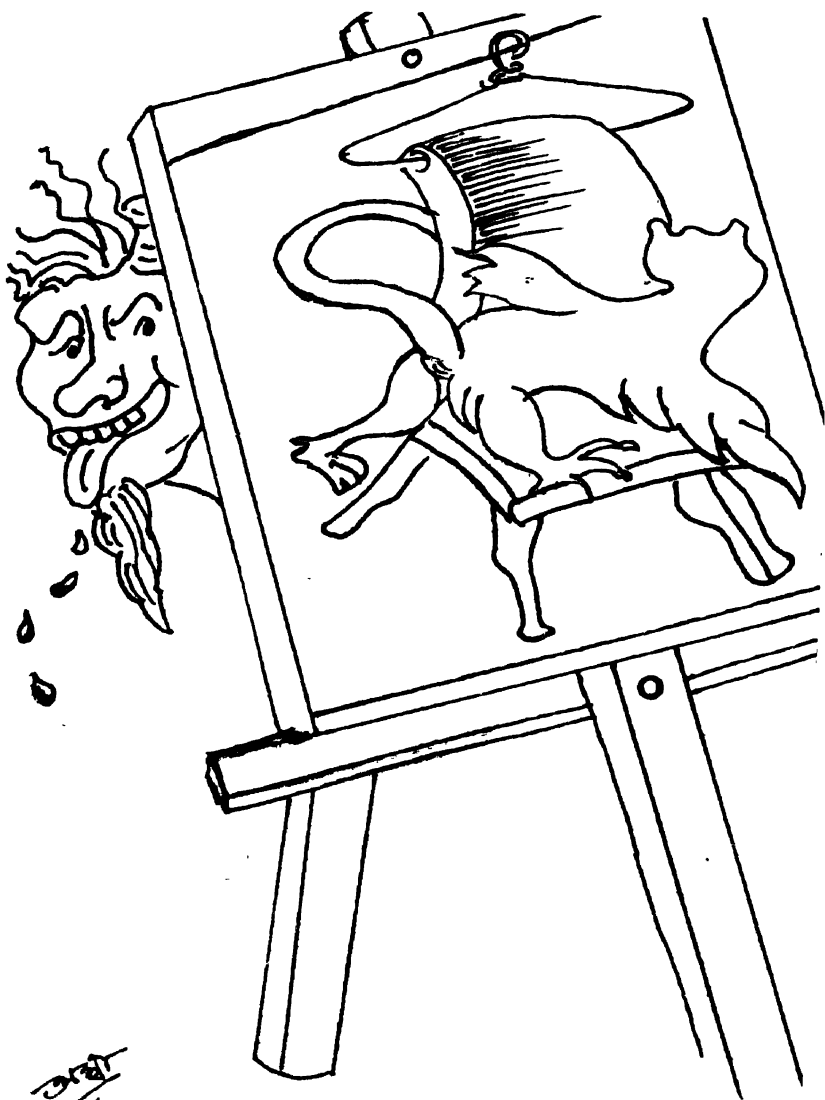
তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, হাসিমুখে আমাকে বৈঠকখানার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সেই ঘরে বসে আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে আমাদের কথাবার্তা বেশ এগিয়ে চলল। রামকিঙ্কর থেকে শুরু করে হাল আমলের ফিদা হুসেন—কেউই আমাদের আলোচনায় বাদ গেল না। কিন্তু কৌস্তভদার এক গোঁ। আমি যত বলি, ওনারা নমস্য শিল্পী, ওনাদের পদধূলি আমাদের পথ, থুড়ি পাথেয়; কিন্তু কৌস্তভদা' সে কথা শুনতে নারাজ। আরামকেদারায় হেলান দিয়ে জমিদারি মেজাজে কৌস্তভদা' বলেই ফেলল, 'রামকিঙ্কর ফুঃ, অবন ঠাকুর ছ্যাঃ, আমিই সেরা।' শুনে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকি কৌস্তভদার দিকে। কৌস্তভদা আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আর তুমিও!' আপ্লুত হয়ে যাই বেদবাক্যে।

আমাদের আলোচনায় হঠাৎ ভাটা পড়ে। একটা অপার্থিব শব্দ কানে এল। এক মুহূর্তে কিছু বুঝতে পারলাম না। কানে তালা লাগার উপক্রম হল। পরমুহূর্তেই তীব্র কৌতূহলী হলাম।

'ওটা কি? সিন্ধুঘোটকের হাহাকার, নাকি ভালুকের আর্তনাদ?'

(যদিও দুটোই অশ্রুতপূর্ব, তবু কেন জানিনা, এমনই মনে হল)

কৌস্তভদা'র নির্লিপ্ত জবাব, 'আমার বাবার অট্টহাসি।'

'কিন্তু পর্দার ফাঁকে উনি কে?'

'উনিই তো আমার বাবা, তোমাকে দেখে ভারি মজা পেয়েছেন কিনা, তাই...।'

ভালভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই পর্দার আড়াল থেকে মুখটা উধাও হয়ে গেল।

(৫)

'খোকাবাবু, চা।'

চমকে উঠলাম। একটা বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে এসে আমাকে চা দিতে এল। আচ্ছা বেয়াদব তো! আমি কিনা খোকাবাবু!

'খোকা, এটা তোমারই।' মিষ্টি গলায় আবার সে আমাকে মনে করিয়ে দিল। থাকতে না পেরে এবারে হাত বাড়ালাম। হঠাৎ একটা চটচটে আঠালো পদার্থ (অনেকটা মিষ্টির রসের মত) গায়ে এসে পড়ল।

আমি কৌতূহলী চোখে কৌস্তভ রায়ের মুখের দিকে তাকালাম।

'ও কিছু নয়। আমাদের পোষা বেজি জনার্দনের প্রাতঃকৃত্য।' কৌস্তভদার নিস্পৃহ জবাব।

আমার গোলায়িত চোখ কপাল ঠেলে মাথায় উঠল। উর্ধ্বনেত্র হয়ে শ্রীমানকে দর্শন করার চেষ্টা করলাম। লাজুক জনার্দন বিদ্যুৎ গতিতে দেওয়াল বেয়ে প্রস্থান করল। কী আর করি, বুঝতে পারলাম, এখানে এসেই মস্ত ভুল করেছি। সময়মত কেটে পড়তে না পারলে...।

অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে তাই চায়ে চুমুক দিলাম। ভুল! আরও মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি আমি! ঐ গাঢ় খয়েরি রঙের তরল পদার্থটা আর যাই হোক, চা নয়। দার্জিলিংয়ের সুগন্ধের বদলে নর্দমার দুর্গন্ধই নাকে এল। চায়েও জনার্দনের প্রাতঃকৃত্য রয়েছে বলে সন্দেহ হল।

বিধাতার এ কী নিদারুণ পরিহাস। প্রথমে সিন্ধুঘোটকের হাহাকার, থুড়ি কৌস্তভদার অশীতিপর বৃদ্ধ বাবার পিলে চমকানো অট্টহাসি আর তারপর জনার্দনের প্রাতঃকৃত্য। অবশেষে

ভয়ঙ্কর চা পান। আমি বাধ্য হয়েই জানতে চাইলাম, 'অতঃকিম্'?

'ঘোড়ার ডিম' কৌস্তভদার ছোট্ট জবাব।

বুঝলাম, এক উন্মাদ পরিবারের মধ্যে আমি আশ্রয় নিয়েছি। এরপর কানে ভেসে এল কৌস্তভদার অনুরোধ—'আমার কবিতার খাতাটা একবার নিয়ে আয় তো ঘোঁতন।' এই ঘোঁতনই আমাকে একটু আগে 'খোকাবাবু' বলে সম্বোধন করেছিল। সেই ঘোঁতন ঘোঁত ঘোঁত করে চলে গেল কৌস্তভদা'র কবিতার খাতা আনতে। যাবার আগে কান পর্যন্ত হেসে আমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে করমর্দন করে গেল।

'বড়ই দুঃখের কবিতা হে।' বলে বিকৃত মুখভঙ্গি করে চোখের জল মুছে নিলেন কৌস্তভ রায়। আমারও চোখে তখন জল এসে গেছে, তবে তা অন্য কারণে। কবিতার খাতার খোঁজে অন্দরমহলে চলে যাবার আগে ঘোঁতনকুমার করমর্দনের ছলে আমার হাতে এমন কিছু নখ-চিহ্ন রেখে গেল, যা দক্ষ চিকিৎসকের প্লাস্টিক সার্জারির পরেও অমলিন থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ঘোঁতনের বয়ে আনা হলদে হয়ে যাওয়া কবিতার খাতা থেকে কৌস্তভদা' খানদুয়েক বস্তাপচা রদ্দি কবিতা আমাকে পড়ে শোনাতেই আমি বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলাম। কিন্তু সেই মর্মভেদী হাহাকারেও কৌস্তভদা বিচলিত হলেন না। চেয়ার ছেড়ে এবারে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কৌস্তভদা কবিতা পড়ায় অনিচ্ছাকৃত বিরতি ঘোষণা করে আমার দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে রইলেন। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠা আমার অস্বাভাবিক লম্বা কান দুটোই তার লক্ষ্য বলে মনে হল। বিপদ বুঝে প্রকান্ড এক লাফ মেরে সামনের ছোট্ট টেবিলটা ডিঙিয়ে গেলাম। বিড় বিড় করে স্বরচিত ছড়া কাটলেন কৌস্তভদা'।

'ঝুলন্ত চেয়ারে উড়ন্ত বেড়াল,
আমার কী কপাল! আমার কী কপাল!'

এদিকে বুলেটের গতিতে গ্রিলের বারান্দার বাইরে চলে এলাম আমি। নিজেকে খানিকটা নিরাপদ ভাবার চেষ্টা করলাম এবারে। কিন্তু বিপদ যে এখানেও! কৌস্তভদা'র নেংটি পরা ভোজপুরী দারোয়ানটা কোথা থেকে উড়ে এসে 'রামজী কি কিরপা' বলে আমাকে জাপটে ধরল। তার গায়ের বুনো গন্ধে আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এল।

'ইয়ে কেয়া হ্যায়? ছোড় দো মুঝে। হামসে কেয়া লেনা-দেনা?' বিশুদ্ধ হিন্দিতে কাতর অনুরোধ করলাম। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। শেষ-মেষ নিধিরামকে স্মরণ করে নাল ফেলি গায়ে।

ঠিক সেই সময়েই এক দাড়িওয়ালা বুড়ো, মাথায় তার কাকের বাসার মত চুল আর ঠোঁটের উপর রান্নাঘরের ঝুলের মত গোঁফ, হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। হাতে তার গুটি কয়েক আধ খাওয়া ছোলা; জনার্দনের প্লেট থেকে তুলে আনা।

'খা ব্যাটা, ক্ষীর খা।'

বিটকেল বুড়োর হাজার আদরেও মুখ খুলি না আমি। মুখটা তার আমার চেনা চেনা

লাগছে। মনে হল, পলকের তরে কোথায় যেন দেখেছি। এদিকে মরিয়া হয়ে বৃদ্ধ আমার তলপেটে হাত বোলান, কাতুকুতু দিতে থাকেন সমানে; পেটে, কোমরে, বগলে, ঘাড়ে, গলায় সর্বত্র। তার বিরাট নখের সযত্ন ইলিবিলিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল। তবু আমি হাসতে থাকি প্রাণপণে। শেষমেষ ঘোঁতনার ডাকে বৃদ্ধ সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

'আজ এই পর্যন্ত। বাকিটা কাল। ইম্বল, একে বেঁধে রাখ।'

বলে দরাজ গলায় হেসে উঠলেন তিনি।

সেই হাসি শুনে চমকে উঠলাম আমি। এ তো সেই সিন্ধুঘোটকের হাহাকার, থুড়ি ভালুকের আর্তনাদ! অ্যাদ্দিন জানতাম, নাম দিয়েই যায় মানুষ চেনা। আপৎকালে গোঁফ দিয়েও। কিন্তু হাসি দিয়েও যে কাউকে কাউকে চিনে নিতে হয়, এ ব্যাপারটা চোখের জলে বুঝে নিতে হল। হাড়ে-মজ্জায় চিনতে পারলাম, ইনিই কৌস্তভদার বাবা।

আর কোনও কথা নয়। গায়ে আমার বিশেষ জোর নেই, জানি। বছরভর পেটের রোগে ভুগি। তবু মাগুর মাছের পাতলা ঝোল (নেংটি পরে দিব্যি নেমে পড়া যায়, এত পাতলা) খাওয়া এই মরকুট্টে মার্কা হাত দুটো দিয়েই এক ঝটকায় ভোজপুরি পালোয়ান ইম্বলকে ছিটকে ফেলে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পাগলের মত ছুটতে লাগলাম আমি। এ পাড়ার নেড়ি যেমন ও পাড়ায় ঢোকে না, তেমনি এ পাড়ার পাগলও চট্ করে ও পাড়ায় ঢুকবে না, এই বিশ্বাসে আমি শুধু ছুটেই চললাম, ছুটেই চললাম।

দেখুন না, এখনও কেমন হাঁফাচ্ছি!

নাম

ব্যাপারটা টের পেলুম খানিক পরে।

ভয়ে লোম খাড়া হয়ে গেল।

এও কী সম্ভব! পাগল না পাৎলুন? বললেই হল?

ভুলে গেছি? কক্ষনো না। নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে আছি।

জোরে জোরে দু'বার মাথা ঝাঁকালাম। আরিঃ! সত্যিই নেই তো। থলথলে থাইয়ে একটা রাম চিমটি কাটলাম! 'উঃ!' উঁহু, মনে পড়ছে না। রিয়্যেলি মনে পড়ছে না। কিছুতেই না।

ভেতরে ভেতরে গর্জে উঠলা[illegible] 'কি [illegible] [illegible]মার?'

কোনও সাড়া নেই।

আবার ধমক দিলাম, নিজেকে। মনে মনে।

'কি নাম আমার? এক্ষুণি বল, নয়তো...।'

আশ্চর্য! ভুলে গেছি। বেমালুম ভুলে গেছি নিজের নামটা। এও কি সম্ভব! শুনেছি আড়ং ধোলাইয়ে লোকে বাপের নাম ভুলে যায়। অনেক সময় নামটা পালটে 'খগেন'ও হয়ে যায়। কিন্তু, তা বলে দিব্যি সুস্থ শরীরে খোদ্ নিজের নামটিই, মানে পিতৃদত্ত এতদিনের পরিচিত নামটাই ভুলে যাওয়া? অসম্ভব!

অনেকক্ষণ লড়ে গেলুম, স্মৃতির সঙ্গে। ব্যাটা বেইমানি করছে। শেষমেষ ঠিক করলাম, ভুলেই যখন গেছি, তখন কী করে আবার সেটা মনে করা যায়, তাই দেখি।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। 'ইউরেকা!' অভাবিত আবিষ্কারের আনন্দে প্রায় তিনফুট লাফিয়ে উঠলাম। এ বয়সেও। কে বলে, আমি বোকা? নেহাত তালে-গোলে এ মুহূর্তে নিজের নামটা ভুলে গেছি, তাই। তবে বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পায়নি। মনে মনে নিজেই নিজের বুদ্ধির তারিফ করলাম। কোনওরকম কার্পণ্য না রেখেই। হ্যাঁ; 'অ্যাডমিট কার্ড।' নিজের নাম, নামের বিচিত্র বানান আর পৃথিবীতে এই অভাগার আসার সেই ভয়ঙ্কর দিনটি সম্বন্ধে যে কোনও সংশয়ের মূর্তিমান সমাধান ঐ অ্যাডমিট কার্ড। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড। চাই-চাই-চাই। এক্ষুণি সেটা চাই। ঝাঁপিয়ে পড়লাম বড় ড্রয়ারটায়। ক্ষিপ্র হস্তে খান তিনেক ফাইল টেনে বার করলাম। মোস্ট ইম্পরট্যান্ট, সেমি ইম্পরট্যান্ট, কোয়াটার ইম্পরট্যান্ট... ছোট বড় নানান সাইজের রঙ বেরঙের কাগজের সঙ্গে ঝটাপটি ঝটাপটি করতে করতে এই সাত সকালেও দরদর করে ঘেমে উঠলাম। ওফঃ! নেই। তাজ্জব! অলৌকিক! হড় হড় করে গোটা ছয়েক জুতসই বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল, হতাশায় ঝুলে পড়া ফ্যাকাশে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। সত্যিই নেই। অথচ ওখানেই থাকার কথা। আলবাৎ থাকার কথা। কিন্তু নেই। কেন নেই, এরও কোনও জবাব নেই। ভাগ্যদেবীর ক্রূর পরিহাস ছাড়া...।

ইয়াহু! কলেজ লাইফের খাতাগুলো। আরেকবার আশায় বুক বাঁধি। ওগুলো এখনও রয়ে গেছে। আর সেগুলোতে বেশ ভালমতই লেখা আছে আমার নামটা। সেই সঙ্গে কলেজের নামটাও। ছোঃ, কলেজের নাম। আগে নিজের নামই...।

'বলি, গেল কোথায়?'

'কি কোথায়?'

'খাতাগুলো? কলেজের?'

আমার চিল চিৎকারে বৌ শিখা ছুটে এল। এতক্ষণে পুরনো শো-কেসটা খুলে ফেলেছি। নেই। একটাও খাতা নেই। তার জায়গায় কতকগুলো স্টেনলেস স্টীলের বাসন। দুপুরবেলায় হাঁক পেড়ে যাওয়া ঐ জোচ্চর বাসনওয়ালাদের কাছ থেকে চুপি চুপি কেনা। হাজারবার বারণ করেছি। তবু...।

'সেগুলো কি আর ছাই আছে নাকি? অর্ধেক তো বিক্রিই করে দিয়েছি।'

'কাকে?' কৌতূহলে ফেটে পড়ি।

'কাগজওয়ালাকে।'

আমি ভেঙে পড়লাম।
'আর অর্ধেক তো...।'
'তো?' কৌতূহলে ফেটে পড়ি, আবার।
'চিলেকোঠায় তুলে রেখেছি।'
এবারও ভেঙে পড়লাম, সশব্দে। 'চিলেকোঠায়!' বাপরে! আরশোলা, টিকটিকি আর চামচিকের উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে ওগুলো উদ্ধার করার চেয়ে; লজ্জার মাথা খেয়ে বরং বৌ-কেই আমার নামটা জিজ্ঞেস করা অনেক ভাল। তবু আমি মরিয়া।
'হ্যাঁ গা, এক পিস্‌ও কি নিচে নেই? না, মানে, মা কালীর দয়ায় অন্তত এক পিস্?'
'নেই।'
আহো! মৃত্যুদন্ডও এত কঠিন হয় না। বললাম, 'তোমাব দয়ায়?'
'নেই।'
'নেই?' আমার ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলার স্বরে নিজেই চমকে উঠি।
'নেই। কিন্তু, ওগুলো আবাব কী মরতে কাজে লাগবে?'
মনে মনে ভাবলাম, হ্যাঁ, ওগুলো এক সময় আমাকে প্রায় মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিয়েছিল বটে। তখন ওগুলোকে হজম করতে ঘাম ছুটে যেত ঠিকই। মৃত্যুকেও অনেক সহজ বলে মনে হত। বেশ মনে আছে, এক সময়, হ্যাঁ, অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিনই। চব্বিশটি ঘন্টাও বাকি নেই। সে কী উদ্বেগ! ক্যালকুলাসের একটা প্রবলেমও সলভ্ হচ্ছে না। অ্যালজেব্রার সব ফরমূলা মনের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেছে। বাইনোমিয়াল থিয়োরেম টা-টা গুড-বাই কবছে মাথার মধ্যে। কাকা বলল, ফেল করলে বেয়ারার কাজে ঢুকিয়ে দেবে। বাবা আরেকটু আগ বাড়িয়ে বলল, 'অপদার্থটা কুলিগিরি করবে।' পর্দার আড়ালে মায়ের ফিস্‌ফিসানি—'খোকা, আটকে গেলে পাশের ছেলের দেখে নিস্। আদ্যাপীঠে মানত করেছি। ঠিক পাশ করে যাবি।' চারদিকে আমাকে ঘিরে জোর শলাপরামর্শ। পরীক্ষাকালীন জরুরি অবস্থা জারি হয়ে গেছে। আর আমি বলির পাঁঠার মত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি, বই মুখে দিয়ে। বাপ! ভাবলে এখনও গায়ে জ্বর আসে।
কিন্তু এখন... এখন যে চাকা ঘুরে গেছে। ঐ দুর্বোধ্য আঁক কষা একপিস্ খাতাও আমাকে এক অমূল্য রত্ন ফিরিয়ে দিতে পারে। আমার নামটা। সত্যিই, নাম ছাড়া বেঁচে থাকা অসহ্য।
ছেলে বড় হয়েছে। গা-ময় নাল ফেলা ট্যালট্যালে খোকা আর নেই। সে লায়েক হয়েছে। ম্যাটিনি শো'র চেয়ে ইদানিং নুন শো'র দিকেই একটু বেশি ঝুঁকে পড়েছে। গোত্তা খাওয়া ঘুড়ির মত। চক্রবর্তীবাবুর ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতাও প্রকাশ পেয়েছে। ম্যাগাজিন ঘেঁটে যত রাজ্যের কেচ্ছায় ভরা 'কানে কানে', 'একান্ত গোপনীয়' পাতাগুলি বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে। এ হেন সুপুত্রের কানে কানে যদি বলি, 'বল তো বাবা, তোমার বাবার নাম কি?' তবে কি হবে, সেটা আন্দাজ করতে পারেন? 'প্যাঁক', হ্যাঁ মশাই, ছেলেব ভাষাতেই বলি, স্রেফ 'প্যাঁক' দিয়ে ছাড়বে।

ছেলের মুখে এমনই সব ভাষা ছোটে। সেদিন, ঝাড়া তিনটি ঘন্টা লড়াই করে আধ লিটার কেরোসিন নিয়ে ফিরছি। চাঁদিটা রাগে দাউ দাউ করছে। এসে দেখি, পাশের ঘরে তারস্বরে ডেক বাজছে। কান ফাটানো ইংরেজি গান ভেসে আসছে দরজা ভেদ করে—'জ্যাক জ্যাক... ইন দ্যা বুশ্‌ বুশ্‌।'

আমি খেটে মরছি। হারামজাদা ফূর্তি করছে!

'খোকা-আ-আ, এ্য-এ্যাই খোকা? অপোগন্ড কোথাকার! দিন দুপুরে লোচ্ছামো...?'

আমার অগ্নিবর্ষণ বাধা পেল। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আমার খোকার গলা শোনা গেল—'অত জোরে হর্ন দিও না, বাবা। পলিউশনের টিকটিকিরা ধরলে সব কিচাইন করে দেবে।'

শুনলেন? শুনলেন ওর কথা? শাঃলা... ইডিয়েট।

নাম হারানোর বিষম ভাবনায় ইতিমধ্যে কয়েক গোছা চুল পেকে গেছে। নেমপ্লেটটা; হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে। বাবা স্বর্গে গেছেন, প্রায় বছর দশেক হল। তখন থেকেই ভাবছি, এবারে পাল্টে ফেলব। ঐ বিষ্ণুচরণ বটব্যালটা উপড়ে... উপড়ে ঐ ইয়ে, মানে, আমার নামটা বসিয়ে দেব। কিন্তু... ওফঃ! এখন হাড়ে হাড়ে পস্তাচ্ছি। 'কাল-ই যদি শালা নামটা মনে পড়ে... হুঁ হুঁ...।' হাত দিয়ে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করি, অসাবধানে। '... তো শালা কাল-ই ওটা খুবলে নেব।' বিকৃত জিঘাংসায় হাতের স্ক্রু-ডাইভারটা দিয়ে নেমপ্লেটে খোঁচা মারলাম। কিন্তু আমার নামটা? এখনও মনে পড়েনি।

দ্যা আইডিয়া! অফিসের ফাইল। নতুন ফাইলটায় সেদিন বেশ কায়দা করে নাম লিখেছি, টিফিনের সময়। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সেন্টার টেবিলের উপর। আজ-কাল-পরশু-তরশু-নরশু, অন্তত এক সপ্তাহের কাগজ স্তূপীকৃত হয়ে আছে। কিন্তু নেই। গোলাপী নতুন ফাইলটা নেই। ওটুকু টেবিলেরই সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গা খুঁজলাম। পায়াগুলো ধরে টানাটানি করতেও ভুললাম না। বেশি ঝাড়াঝাড়িতে কাগজের ভাঁজ থেকে আমার গুণধর পুত্রের সাধের এক পিস 'ডেবোনেয়ার' বেরিয়ে পড়ল। তোবা তোবা! এতো যে কোনও বাবার গর্বের কথা। ছেলে ইংলিশ ম্যাগাজিন পড়ে। উল্টে দেখলাম। কিন্তু, এ কী! বেশিক্ষণ চোখ রাখা যাচ্ছে না কোন পাতাতেই। জন্মদিনের পোশাকে এরা কারা! কেমন করে সব তাকিয়ে আছে আমার দিকে! দেখতে দেখতে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম, এ বয়েসেও। বেশি বাড়াবাড়ি হলে আবার ইয়ে হয়ে যাবে ভেবে সযত্নে সেটিকে ভাঁজ করে, আবার কাগজের ফাঁকে রেখে দিলাম। নাম, আমার নাম চাই। ফাইল অফিসে। এতক্ষণে মনে পড়েছে! অফিসে গিয়েই...। বুকের ভেতরটা ধক্‌ করে উঠল। শত্রুতা, স্রেফ আমার সঙ্গে শত্রুতা। আজ রোববার, নো চান্স। আঃ, পুরো একটা দিন নাম ছাড়া বেঁচে থাকা। হরিবল্‌! হরি বোল!

বুকের উপর আদ্দির পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে, তেলচিটে পুরনো থলেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। রোববারের বাজার। মনে অনেক আশা। বহু চেনা-জানা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কেউ না কেউ ডেকে কথা বলবে। নাম ধরে ডাকবে। কিন্তু বুঝব কি করে, আমাকেই ডাকছে? নামটা

তো বিলকুল ভুলে খেয়েছি। তবে একবার শুনলে নিশ্চয়ই তড়াক করে মনে পড়বে।

বাজার করতে করতে মানিব্যাগ হাল্কা হয়ে গেল। শেষমেষ এক কোণে পড়ে থাকা খুচরো পয়সা ক'টা দিয়ে বাতাসাও কিনে নিলুম। তাজ্জব! কেউ আমায় ডাকল না অবধি। দু'জন মিটিমিটি হেসে কাতলা মাছ লোফালুফি করল। একজন নতুন আলুর গন্ধ নিয়ে, আলুলায়িত চোখে বলল, 'ভাল আছেন, স্যার?' নিকুচি করেছে তোর স্যারের। স্যারের কী কোনও নাম নেই? সেটা ধরে ডাকতে পার না? ঐ... ঐ তো কেলে বুবুটা বিড়ি ফুঁকছে। অন্যান্য দিন এড়িয়ে যাই। তবু রোজই ডেকে দু'চারটে ফালতু কথা বলে। আজ আনাজ ভর্তি থলেটা নিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে গেলাম। অযাচিতভাবে গলা খাঁকারি দিলাম। তবু ব্যাটা পাত্তা দিল না। যেন দেখতেই পায়নি। হাতি যখন কাদায় পড়ে, গুবরে পোকাও লাথি মারে। আমি মরিয়া। একেবারে ঘাড়ের কাছে চলে এলাম।

'এ্যই যে বুবু, ভাল আছ?'

'ও, বটব্যাল দা'? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফাইন ফাইন।'

শাঃলা, রোজ নাম ধরেই ডাকে। আজই ঐ বিশ্রী টাইটেলটা ধরে টানাটানি কেন?

'আপনি কেমন আছেন?'

'বেড়ে আছি। তোফা আছি।'

পান্তুয়ার মত মুখ করে এগিয়ে যাই। হল না। এখানেও হল না। পেছনে বুবুর হেঁড়ে গলা শুনতে পেলুম। 'আচ্ছা দাদা। পৃথিবী গোল। আবার দেখা হবে।'

এমনিতে ডিক্সেনারিতে আমার অ্যালার্জি আছে। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েই সংসদের মোটা অভিধানটা খুলে বসলাম। আগাপাস্তলা খুঁজে দেখব। বাছাধন, যাবে কোথায়? অপ্রাকৃতিক শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে কালো অক্ষরগুলো একেবারে ঠুক্‌রে খেতে লাগলাম। স্বরবর্ণ শেষ করে সোৎসাহে 'ক'-এ ঢুকে পড়ি। 'কংফুচি', 'কংস', 'কক্‌খটী', পেরিয়ে 'কটমট' আর 'কটরমটর'-কে কটাক্ষ করে, সোজা 'খ'-এ 'খোঁচা' মারি। 'খোঁটা, 'খোট্টা', 'খোঁদল'... রামোঃ! এও কি মানুষের নাম হয়? মহোৎসাহে 'গ'-য়ে 'গোত্তা' খাই। 'গুজিয়া' আর 'গঞ্জিকা'র প্রলোভন এড়িয়ে 'গড়িমসি' করে 'ঘ'-এর ঘাড়ে চেপে বসি। 'ঘটিরাম'? 'ঘড়িয়াল'? উঁহু। এগিয়ে যাই। অসহ্য! আর পারা যায় না। অবশেষে হাততোলা 'ঝ-এ এসে হাত তুলে দাঁড়াই। স্যারেন্ডার। এভাবে সম্ভব নয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। প্রায় হাজার আষ্টেক ঘোড়েল শব্দ ঘুঙুর পরে আমার ভেতর নেচে বেড়াচেছ। টেরিফিক্! অগত্যা সেই বৌয়ের আঁচলেই মুখ ঘষি।

'এ্যই, এ্যই শিখা, আজ তোমাকে না হেভি...।'

'কি হয়েছে তোমার? জ্বর জ্বর?' শিখার চোখেমুখে উদ্বিগ্নতা।

'এ্যই শোন, মানে, তুমি জান কি?'

'কি জানি?'

'এই ইয়ে, মানে আমার ইয়েটা।'

'ইয়ে ইসে কী করছ? ঝেড়ে কাশ তো।'

'আমার ইয়েটা। মানে নামটা। জানো নাকি?'

আমি গদ্গদ চিত্তে শিখার গালে নাক ঘষার চেষ্টা করি।

'কি আবোল-তাবোল বকছ? অ্যাঁ?'

'না, মানে, জানো তো? নিশ্চয়ই জানো। তা ইয়ে, মানে,... একবার বলো না।'

'কি বলব?'

'আমার নামটা?' কৌতূহলে শিখার কোলে উঠে বসি। এ বয়সেও।

'ইরিঃ! তোমার কি ভীমরতি হয়েছে? বুড়ো বয়েসে ঢলাঢলি করছ। খোকার সামনে এসব ন্যাকামোর মানে কি?'

শিখার ফোঁসফোঁসানিতে নিজেকে গুটিয়ে নিই। শামুকের মত।

'না, ঐ এমনি আর কী। মজা করছিলুম। হেঃ হেঃ।'

চোখ ফেটে জল বের হবার জোগাড়। পর্দার ফাঁকে আমার ম্যাচিওর খোকার অবাঞ্ছিত মুখ। জোর করে হাসবার চেষ্টা করি। পারি না। কেবল ঘড়ঘড়ে আওয়াজে শিখার নাক কুঁচকে ওঠে।

দুপুরে গলা দিয়ে ভাত নামল না। নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম।

'ঘাবড়াও মাৎ। এক সময় ঠিক মনে পড়বে। নিজের নাম কেউ ভুলতে পারে না। কক্ষনো না।'

তবু থেকে থেকে শিউরে উঠি। এ রোগের ওষুধ কি? পাড়ায় এক নতুন সাইক্রিয়াটিস্ট এসেছেন। তার কাছে একবার...। 'হুম-ম্। শেষ পর্যন্ত তাহলে পাগলই হলুম। হুম্-ম্।' লোমহর্ষক আতঙ্কে ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে গেলাম। আটচল্লিশ নয়, পঞ্চাশও নয়। একেবারে খাঁটি উনপঞ্চাশ বায়ুই ভর করেছে আমার মাথায়। নইলে...।

'ওউপ্!'

খালি পেটেই ঢেকুর তুললাম। ভয়ঙ্কর ঘুম পাচ্ছে আমার। মাথার ভেতর একটা রিনরিনে কনসার্ট নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। একটা ভারি সুগন্ধে চোখ কান বুজে আসছে। চোখের পাতাগুলো ক্রমশ ভারি হয়ে আসছে। খানিকবাদেই নাক কথা বলা শুরু করল।

'ঘুর-ঘুর-ঘুরুৎ। ফুর-ফুর-ফুরুৎ। না-আ-ম- ফুরুৎ।'

দূর থেকে রঙ বেরঙের ধনেশ পাখি উড়ে আসছে। ডানা মেলে। আকাশ জুড়ে শুধুই পাখির মেলা। নাম না জানা হাজারো পাখি। আর তলা দিয়ে, মানে আমাদের অতি পরিচিত বঙ্কুবিহারী সরণী দিয়ে চলেছে একটা বিরাট মিছিল। নামহীন একদল মানুষের মহামিছিল। হাতে তাদের বড় বড় প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা—'দুনিয়ার নামহীনেরা এক হও', 'বাঁচতে গেলে নাম চাই।' আমিও গর্জে উঠলাম। সবার সঙ্গে। 'নাম-নাম-নাম চাই।'

'ধনঞ্জয়বাবু, বাড়ি আছেন না কি?'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম, বিছানা থেকে।

কি শুনলাম! বুলেটের গতিতে দরজা খুলে বাইরে এলাম।

'এ্যাই যে ধনঞ্জয়বাবু,...।' ঘোঁতনবাবু একমুখ প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার সাত বছরের পাওনাদার। 'তানা-না-না' করে অনেক ঘুরিয়েছি। আজ... আজ..., আহো! উনি যে এত ভাল, এত বিউটিফুঃ, তা তো আগে কোনওদিন...। সোল্লাসে ওনাকে ঘিরে, দু'হাত তুলে, নেত্য করতে লাগলাম। পেয়েছি, পেয়েছি। আহ্লাদে ওনার কোলেই চেপে বসলাম। 'উম্-ম্। উম-ম্'। চুমোতে চুমোতে দু'গাল ভরিয়ে দিলাম। কোলের মায়া ত্যাগ করে সোৎসাহে কাঁধে উঠবার চেষ্টা করি।

'আরে... আরে... এ কী করেন, ধনঞ্জয়বাবু! কী করেন, কী করেন! ছাড়ুন মশাই। আমার সুড়সুড়ি লাগছে যে।'

'বলুন বলুন, আরেকবার বলুন।'

'কি বলব, অ্যাঁ? আপনি যে কী হলেন মশাই! হিঃ হিঃ, অমন কাতুকুতু দিচ্ছেন কেন? কি বলব?'

'ঐ নামটা। মানে, আমার নামটা। বলুন বলুন।'

'কিন্তু কেন? বললে, ছেড়ে দেবেন তো?'

বুঝতে পারছি, আমার এই কোলে উঠে বসাকে উনি ভাল চোখে নেননি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ; নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।' এতক্ষণে আমার মুখে রিয়্যালি হাসি ফুটেছে।

'বলছেন তো। কিন্তু দিচ্ছেন কই? তা মশাই, ঘাড়েই উঠুন আর টাকই চাটুন, ও টাকা আমি ছাড়ছিনে।'

পাওনাদার হো তো অ্যায়সি!

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব পাবেন। স-অ-ব।'

'কি করে দেবেন? এই তো সেদিন বললেন, 'পকেটমার হয়েছে। ভাঁড়ে মা ভবানী।'

'হাঃ হাঃ, আমার পকেট আপনি ছাড়া আর কে মারবে বলুন।'

'কি?!'

'মিথ্যে কথা। কিৎসু হয়নি। প্রয়োজনে বলতে হয়, বুঝলেন? কিন্তু আমার নামটা...?'

'ওঃ! বলছি বলছি। ভাল করে শুনুন...।'

ঘোঁতনবাবু আমার নামটা ক্রমাগত বলে চলেছেন। আমিও ওনার কোল থেকে নেমে পড়েছি। আমার কানের পাশে অনর্গল গর্জে উঠেছে আমার নামটা। বোমার মত। আমার নাম... আঃ,... আমার হারিয়ে যাওয়া নাম। কী সুন্দর; কী সুন্দর!